দিশে-পাগলা ।

দিশে-পাগ্‌লা।

[দিশে ও নিশে নামে দুই পাগলের কথোপকথন।]

প্রথম কাণ্ড।

রামগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সংগৃহীত।

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ মজুমদার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

ধাত্রীগ্রাম—কাল্‌না, বর্দ্ধমান।

Calcutta:

PRINTED BY P. M. SOOR & Co., CROWN PRESS,

2, GOABAGAN STREET.

1887

দিশেপাগ্‌লা।

দিশে ও নিশে নামে দুই পাগলের কথোপকথন।

প্রথম কাণ্ড।

প্রথম কারখানা।

পাগলদের পরিচয়।

দিশে ও নিশে নামে দুই ব্যক্তি প্রবৃত্তিসমাজে পাগল বলিয়া পরিচিত, কিন্তু উহারা যে, কি প্রকারের পাগল, এবং উহাদের উদ্দেশ্যই বা কি, তাহা আমরা এ পর্য্যন্ত ঠিক্ বুঝিতে পারি নাই। তবে দুজনায় বেশ বন্ধুত্ব আছে বলিয়া বোধ হয়; তাও যে, দুজনে সর্ব্বদা একত্রে থাকে, তা নয়, তবে যখন উঁহাদের দুজনে দেখা সাক্ষাৎ হয়, তখন উহারা যে সকল কথা বলে, তা, ওদের ঐ সব কথা নিতান্ত পাগলের মত কথা নয়, তার মধ্যে অনেক কথা বড় পাকা পাকা! যাই হোক্, ওদের ভাব অনেকটা বোঝা গিয়াছে।

দিশেকে আমরা বরাবর থেকেই জানি; ও চাক্‌রি থাক্‌রি কোরে, বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন কোর্‌তো, এবং আমাদের দলে উহার বেশ পসার ছিল। কিন্তু উহার মতি সর্ব্বদা অস্থির বলিয়া আমাদের বোধ হোতো, কেমনা, ও যে কোন কায্ কোর্‌তো, তার শেষ কোর্‌তো না; তাতে ওর ঢের টাকা নষ্ট হোতো, কিন্তু ও তাতে দৃক্‌পাতও

কোর্‌তো না; সে জন্য আমাদের মধ্যে কেউ কেউ, উহাকে "বর্ব্বরস্য ধনক্ষয়" বোল্‌তেন। আরও আমরা দেখিচি যে, এখনকার পাড়া-গাঁয়ের লোকের মধ্যে অনেকেরই কেবল আত্ম-স্বার্থ ও অন্যের বিষ-য়ের প্রতি লোভ হয়, এবং পরশ্রীতে অত্যন্ত কাতর হন্; কিন্তু ওর সেরূপ ছিল না, বিশেষ, উহাকে আমরা কখন পরের বিষয়ে লোভ কোরতে দেখি নাই। এতেই, বোধ হয়, যে, বরাবর থেকেই ওর্ মনে পাগলামির একখানা কিছু আছে।

আর দিশেও আমাদিগে একদিন মনের কথা খুলে বোলেছিল্;—ও বলে যে, ভাই! তোরা বেশ নিশ্চিন্ত আছিস্, কেননা, তোরা এই সংসারকেই সার সিদ্ধান্ত কোরে, নিয়তই সাংসারিক কার্য্যে রত থাকিস্, কিন্তু আমার, ভাই, আমি, কবে মোর্‌বো, কবে মোর্‌বো, প্রায় এই বিষয়টা সর্ব্বদাই মনে হয়, এবং সংসার যে, চিরস্থায়ী এবং সার নয়, এটা ঠিক্ বিশ্বাস হোয়ে, সারই যে, কি, তাই মন আন্দোলন করে; সেই জন্য আমার মতি স্থির থাকে না, তবে মায়াতো মন থেকে ঘোচে না, তাই ঐ মায়ার ঘোরে কোন একটা কায্ আরম্ভ করি, আবার একটু চট্‌কা ভাঙ্গলেই, আর সে কায্ কোর্‌তে ইচ্ছা হয় না; এবং মাঝে মাঝে ঐরূপ চট্‌কা ভাঙ্গে বোলে, কায্ আরম্ভ কোরে, তার আর শেষ কর্‌তে পারিনে। মায়ার ঘোরে, ভাই! একবার একবার, বেশ কায্ কোর্‌তে মতি হয়, এবং কোর্‌তেও লাগি, কিন্তু মাঝখানে চট্‌কা ভেঙ্গে সবই ভেঙ্গে যায়; আমার এই একটা চট্‌কা-ভাঙ্গা দোষ জন্মেচে।

—দিশে যা বোল্লে, তা ঠিক্; ওর কথা অবিশ্বাস করবার কারণ নাই, কেননা, ও বেশ ভাল ভাল চাকৃরি কোরে বিলক্ষণ টাকা উপা-র্জ্জন কর্‌তো, তা আমরা জানি; এতে যে, টাকার অভাবে ওর কাযের শেষ হোতো না, তা কেউ বোল্‌তে পার্‌বে না। তবে যে, ঐরূপ চট্‌কা ভাঙ্গা জন্য উহার কাযের শেষ হোতো না, তাহাই সত্য; আমাদের দলে ঐরূপ চট্‌কা ভাঙ্গাকেই পাগলামি বলে। আবার এখনও দেখচি যে, উহার টাকা উপার্জ্জনের আস্থা মন থেকে একবারে

ঘুচে গ্যাচে, কারণ, ও ব্যক্তি অনুপযুক্ত নয়, এবং এখনও বিলক্ষণ কার্য্যক্ষম। আবার উহার যে চাকুরি, তা বাঁধা চাকরি বোল্লেই হয়; ও যদি এখনও চাকুরি কোরে টাকা উপার্জ্জন কোর্ত্তে চায়, তা হোলে আমরা কেউ ওর ওপর বেড়ে চোল্‌তে পারিনে: তাতে যে, ও ঐ সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে, যেরূপ ভাবে চোল্‌চে, তাতে ওকে সহজ লোক বোলে বোধ হয় না। যাই বল, আর যাই কর, ওরূপ সুবিধা আমরা কখনই ছাড়্‌তে পারতাম না,—আমরা এখনও দু টাকার লোভে পাঁচ ক্রোশ রাস্তা-চোল্‌তে দৃক্‌পাৎও করি না, এবং সেই জন্যই আমরা ওকে পাগল বলি। যাই হোক্, আমরা ওর মতন কোর্‌তেও পারি না, এবং মনে মনে ওর নিন্দে কোর্‌তেও ছাড়িনে।

আর নিশেকে আমরা আগে বড় একটা দেখি নাই, তবে আজ কালই কখন কখন দিশের সঙ্গে বেড়াতে দেখ্‌চি; ফলে ওরা দুজনে বেশ মিলেচে। দিশে আর নিশে, এদের দুজনায় প্রভেদ কি? প্রভেদ আর তো কিছুই দেখি না, তবে যেমন দ, (ধ) আর ন মাঝখানে "ধ" ব্যবধান, তেমনি দিশে, আর নিশে, মাঝখানে "ধাঁধা" মাত্র ব্যবধান।

ইহাতে ঐ বিষয়ে দুই রকম ভাব গ্রহণ করা যাইতে পারে; যথা,—ঐ ধাঁধা মিটিয়ে, ঐ দুই জনাকেই লয় কোর্‌তে পারা যায়, কেবল নাম মাত্র থাকে; আবার প্রয়োজনমতে দুজনাকে এক জনও কোরে কেবল দুটো নাম রাখিতে পারা যায়।

একদিন দিশে ও নিশে দুজনে একটি সামান্য বনমধ্যে একটা বট-তলায় বোসে, নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে নিশে দিশেকে জিজ্ঞাসা করিল।

দ্বিতীয় কারখানা।

নিশেঃ—ভাই এই গ্রামে ও অন্যান্য গ্রামে, বলনা কেন, ভাই! প্রবৃত্তিসমাজের সব গ্রামে, যে সব মানুষ বাস কোচ্চে, ইহারা সব কোন্ আশ্রমী? আর মানুষ কি? মানুষের কায্ কি? এবং সে সম্বন্ধে ওরা বুঝেছেই বা কি?

দিশেঃ—বেশ কথা আমাকে শুধুলি! আমি তো আশ্রমই কাকে বলে, তাই জানিনে, তা, তোর কথার কি উত্তর দেবো? তুই যদি আগে আশ্রম কি, আমাকে বেশ কোরে বুঝিয়ে দিতে পারিস্, তা হোলে টেনে টুনে দেখ্লে, বোধ হয়, আমি এক প্রকার তোর কথার উত্তর দিতে পারি। আরও, ভাই! বোলে রাখ্চি যে, মাঝে মাঝে দুটো একটা কথা, যা আমাকে ঠেক্‌বে, তাও বোলে দিতে হবে।

নিশে:—আজ তো আর বেলা নাই, আর যে কথাটা বোল্‌তে হবে, সেটাও নিতান্ত সোজা কথা নয়, যে এক কথাতেই ফুরিয়ে দেবো, আর তুইওতো সহজে ছাড়বিনে! আমারও একটু বরাৎ আছে, আমাকে ঐ নদীর ধার দিয়ে যেতে হবে; আবার দেখ্‌চি, অশৌচ হোলো, তা হোলে তো আর এখন ও সব কথা বোল্‌তে পার্‌বো না। আবার স্নান কোর্‌তে হবে। তা, ভাই! আজ যাই চলো, আমি কাল্ সকালে স্নান কোরেই এই খানে আস্‌বো, তুইও আসিস্, তা হোলে দুজনে নিশ্চিন্ত হোয়ে, সব কথা বলাবলি কোর্‌বো। ভাই! আরও একটা কথা তোকে বোলে রাখি, আমি, ভাই, লেখা পড়া জানিনে, শাস্ত্রও পড়ি নাই, লোকে আমাকে প্রায় পাগলই বলে; তা তারা আমাকে যে ভাবেই পাগল বলুক্‌না ক্যানো, কিন্তু আমি ঐ সুখেই টিকে আছি, কেননা আমার সর্ব্বদাই এই চিন্তা যে, আমি কতদিনে আসল পাগলামিতে দাঁড়িয়ে, শান্তি যে জিনীস্‌টে কি, তা একবার জান্‌বো।

যদিও পাগল হওয়া বড় শক্ত ব্যাপার, কিন্তু আমাকে দুষ্কর বোলে বোধ হচ্চে না; কারণ লোকেও আমাকে পাগল বোল্‌চে, আর আমার মনে, আমি যে একজন পাগল, এ অভিমানটিও বিলক্ষণ আছে; আবার সেদিন স্বপন দেখেছিলাম যে, আমি যেন সেই খেপা দিগম্বর ঠাকুরের সঙ্গে বেড়াচ্ছিলাম, ও লোকে, শান্তে পাগলা বোলে, আমার গায়ে ধূলা দিচ্ছিলো। আবার সেদিন আট্‌বাঁকা ঠাকুরের টোলের কাছ দিয়ে যেতে যেতে শুন্‌লাম, তিনি বোল্‌ছিলেন যেন,—

মুক্তাভিমানী মুক্তোহি বদ্ধো বদ্ধাভিমান্যপি।
কিং বদন্তীতি সত্যেয়ং যা মতিঃ সা গতির্ভবেৎ ॥
(অ, স, ১।১০)

যে ব্যক্তি মুক্তাভিমানী, তিনিই মুক্ত; যে ব্যক্তি বদ্ধাভিমানী, সেই ব্যক্তিই বদ্ধ; এই যে কিংবদন্তী * আছে, ইহা সত্য, কারণ, মনের যেরূপ ভাব, গতিও সেইরূপ হইয়া থাকে।

আবার নারদ ঠাকুরও একদিন বোল্লেন,—

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাম্ নির্ব্বন্ধনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিধ্যত্যেষা-মভীপ্সিতম্ ॥
(নারদীয় পুরাণ।)

যাঁহাদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইবার জন্য স্থির মতি হয়, অচিরাৎ তাঁহাদিগের সকল প্রকার জ্ঞানলাভ ও বাসনা সিদ্ধি হয়।

ঐ সব দেখে শুনে আমার বেশ আশা আছে যে, আমি পাগল হোতে পার্‌বো, তাতে আর সন্দেহ কর্‌বার কারণ দেখ্‌চিনে। আর বেশ কোরে দেখেছি যে, এ জগতে পাগল হোতে না পার্‌লে, আর সুখ নাই।

---

* জনরব।

আর ক্ষেপা দিগম্বর ঠাকুর আমাকে বোলে দিয়েছিলেন যে, তুই যদি পাগল হোতে ইচ্ছা কোরিস্‌, তাহোলে কারু সঙ্গে থাকিস্‌নে, নৈলে পাগল হতে পার্‌বিনে। তা, ভাই, দিশে দাদা! আমি তো তোকে ছাড়্‌তে পার্‌বো না, আর তোকে ছাড়্‌বারও দর্‌কার দেখ্‌চিনে; কেননা তোতে ও আমাতে কেবল মাঝ্‌খানে ধান্ধা ব্যবধান বৈ তো নয়? তা, সে টুকু মিটিয়ে ফেল্‌বো, তা হোলেই দুজনে একলা হবো।

আরও একটি কথা বোল্‌ছি যে, ভাই! আমি তোকে যা বোলবো, তা সাধু ভাষায় বোলতে পার্‌বো না, তবে আমি যা বোল্‌বো, তা আমার নিজের বুলিতেই বোল্‌বো। সাধু ভাষা কাকে বলে, আমি তার অর্থই বুঝ্‌তে পারিনে। লোকে বলে যে, এখনকার ধনবান্‌ ও লেখা পড়া শেখা লোকই সাধু, ও তাঁদের বুলিই সাধু ভাষা। কিন্তু পাগলেরা কেবল ধনী ও লেখাপড়া শেখা লোক্‌কে সাধু বলে না। সেদিন শঙ্কর ঠাকুর সাধুর লক্ষণ বোলেছিলেন,—

কে সন্তি সন্তোঽখিলবীতরাগাঃ।
অপাস্তমোহাঃ শিবতত্ত্বনিষ্ঠাঃ॥

যাঁহারা সমস্ত বিষয়ে অনুরাগ এবং মোহশূন্য হইয়া পরমাত্ম-তত্ত্বনিষ্ঠ হইয়াছেন, তাঁহারাই সাধু।

তাহোলে ভাষা ও শাস্ত্র শিক্ষা করিলে সাধু হয় না, এবং সাধু হইতে হইলে লেখা পড়া ও শাস্ত্র শেখ্‌বার দরকার নাই; বিষয়ে এবং ধনে একেবারে আস্থাশূন্য হইতে হয়। আমরা যে পাগল হবার চেষ্টা কোর্‌চি, সাধু ঐ পাগলামি পথের একটি আড্ডা, তা হোলে আমরা যখন ঐ আড্ডায় পৌঁছিবো, তখন আমরাই সাধু হবো; ও আমাদের বুলিকেই পাগলেরা সাধু ভাষা বোল্‌বে। ঐ আড্ডা আমাদের আর বেশী দূর নয়, গুরুকৃপা হোলে আমরা শীঘ্রই ঐ আড্ডায় পৌঁছুতে পার্‌বো, তাই বোল্‌চি যে, একজন সক, আসল পাগল খুঁজে গুরু কোরলে হয় না?

দিশেঃ—ভাই, গুরু কোর্‌লে কি হবে, উপদেশ পাবার জন্যই তো গুরু করে, তা কেবল উপদেশে তো কিছু হয় না; আগে উপদেশ গ্রহণের অধিকারী হোতে হয়, এবং নিজেও কায করা চাই। মনে সর্ব্বদা আন্দোলন ও আলোচনা কোর্‌তে কোর্‌তে জ্ঞানের পর্‌দা একবার ফাঁক কোরে দিতে পার্‌লেই, এই জগৎপ্রপঞ্চ ভোলা শিখতে পাবাযায়, এবং তাই শিখ্‌তে শিখতেই আসল পাগল হোয়ে দাঁড়ায়। আর সৎ গুরুতো খুঁজলেই সহজে পাওয়া যায় না। শুনেচি, সিদ্ধার্থ বুদ্ধদেব তো গুরু করেন নাই, তিনি আপনিই জ্ঞান ও সাধনার দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাই ভাই! এ পাগলের মনেও একবার একবার উদয় হয় যে, গুরু টুরু সব ভ্রম—আপন-জ্ঞানই আপনার গুরু। তবে পর্‌দা ফাঁক করা চাই! আর শাস্ত্র পোড়্‌লে ও শুন্‌লে, তাতেও তো কিছু ফল হয় না, নিজের কায ভিন্ন স্বাস্থ্য লাভের উপায় নাই। সে দিন আটবাঁকা ঠাকুরের কথা শুনে ঐ দুই বিষয়েরই ভ্রম ঘুচেচে, তিনি বলেন,—

হরো যদ্যুপদেষ্টা তে হরিঃ কমলজোঽপি বা
তথাপি তব ন স্বাস্থ্যং সর্ব্ববিস্মরণাদৃতে॥
(অ, স, ১৬।১১)

যদি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কিম্বা মহেশ্বর স্বয়ং তোমাকে উপদেশ দেন, তথাপি যে পর্য্যন্ত তুমি জগৎপ্রপঞ্চ ভুল্‌তে না পারবে, সে পর্য্যন্ত তুমি স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিবে না।

আচক্ষ্ব শৃণু বা তাত নানাশাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
তথাপি ন তব স্বাস্থ্যং সর্ব্ববিস্মরণাদৃতে॥
(অ, সং ১৬। ১)

বৎস? যদি তুমি নানা শাস্ত্র বিস্তারিত রূপ পাঠ বা শ্রবণ কর, তথাপি যে পর্য্যন্ত সমুদায় প্রপঞ্চ বিস্মৃত না হইবে, সে পর্য্যন্ত তুমি স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিবে না।

আর ভাই, তুই আক্ষেপ কোর্‌ছিলি যে, আমি লেখা পড়া জানিনে, ও শাস্ত্র শিখি নাই, তা শুধু লেখা পড়া ও শাস্ত্র শিখ্‌লে তো পণ্ডিত হয় না। এই যে সব লোক, যাঁরা বিদ্যালয়ে (টোলে) লেখা পড়া ও শাস্ত্র শিখে উপাধি নিয়ে বেরিয়েছেন, এবং তাঁদিগে লোকে পণ্ডিত বোল্‌চে, কিন্তু তাঁরা তো সবাই প্রকৃত পণ্ডিত নন্‌, কেননা তাঁহারা প্রকৃত জ্ঞান উপার্জ্জন দ্বারা শান্তি লাভ করিবার উদ্দেশ্যে তো শাস্ত্র শেখেন নাই। অন্য লোকে যেমন অর্থ উপার্জ্জনের জন্য ডাক্তারি, ওকালতি আদি শিখিয়া ব্যবসা কোর্‌চেন, তাঁরাও তেমনি শাস্ত্র শিখে অর্থ উপার্জ্জন জন্য ব্যবসা আরম্ভ করিয়া, শাস্ত্রের দোকান খুলে বোসেচেন। তাঁদের শাস্ত্র শিখিবার গোড়াগুড়ি উদ্দেশ্যই কেবল পয়সা উপার্জ্জন; তাই তাঁরা মোটা লোকদিগে দশটা ভুজং ভাজাং দিয়ে, ও দুটো বচন আউড়ে আত্মবিস্তৃতি দেখাইয়া, তাঁদের কাছ থেকে বেশ দশ টাকা উপার্জ্জন করেন, এবং তাঁদের সকল কাযে নিমন্ত্রণপত্র, এবং তৎসূত্রে বিদায় পাবার আশায়, ছাত্র পড়ানোর ভাণ কোরে এক এক টোল খুলে বোসে আছেন। আবার তাও দেখ্‌চি যে, একটু পসার হোয়ে একবার নিমন্ত্রণপত্র চোলে গেলে, আর টোল না রাখ্‌লেও চলে, নিমন্ত্রণপত্র আর বন্ধ হয় না। আবার কারু কারু ঐরূপ নিমন্ত্রণপত্র পাবার জন্য অনেক লোকের উপাসনা এবং উপরোধও কোর্‌তে হয়। যদি জ্ঞান উপার্জ্জন দ্বারা শান্তি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁরা শাস্ত্র শিখ্‌তেন, তা হোলে তাঁরা শাস্ত্রের সার ও সূক্ষ্ম অর্থ গ্রহণ কোর্‌তে পার্‌তেন, এবং এই মোটা ধন অর্থাৎ পয়সার জন্য লালায়িত হইয়া তাঁহাদিগে আর এরূপ ভোগ ভুগ্‌তে হোতো না। তা আমরাই বোল্‌চি যে, এটা তাঁদের ভোগ, কিন্তু তৃষ্ণার এম্নি টান্‌ যে, তাঁরা মনে কোর্‌ছেন, এটাই আমাদের সুখ, সম্মান ও সৌভাগ্য। তা আমাদের কথাতো পাগলের কথা। যাই হোক, শাস্ত্র পড়্‌বার ও ছাত্র পড়াবার আসল উদ্দেশ্য ও শাস্ত্রের সার এবং সূক্ষ্ম অর্থ মুনি ঠাকুররা ও মুনিবিশেষ ব্যক্তিগণই জান্‌তেন ও জানেন।

নারদ ঠাকুর সে দিন ও বিষয়ের ধোঁকা মিটিয়ে দিয়েছেন। তিনি বোল্লেন,—

যেন সর্ব্বং পরিত্যক্তং স বিদ্বান্ স চ পণ্ডিতঃ।

ম, ভা, মো, ধ।

যিনি সকল ত্যাগ কোর্‌তে পেরেছেন, তিনিই বিদ্বান্ এবং তিনিই পণ্ডিত।

আরও অনেক জায়গায় অনেকের মুখে ঐরূপ উক্তি শুনেছি, এবং পণ্ডিত শব্দের ধাত্বর্থরও ঐ ভাব।

এই সব দেখে শুনে বেশ বোধ হোচ্চে যে, শাস্ত্র শেখা পণ্ডিত হবার কারণ নয়, সব ত্যাগ কোর্‌তে না পার্‌লে আর পণ্ডিত হয় না। তা হোলে যাঁরা কেবল গ্রহণ গ্রহণ শব্দ কোর্‌ছেন, তাঁরা তো পণ্ডিত নন্। তাঁরা কেবল মোটা-পণ্ডিত, এবং মুনিবিশেষ ব্যক্তি ও সন্ন্যাসিগণই আসল এবং সরু পণ্ডিত।

আবার সে দিন জ্ঞানসঙ্কলিনীতন্ত্রবাগীশ্ মহাশয়ের সঙ্গে ঐ সম্বন্ধে ঢের কথা বার্ত্তা হোয়েছিল, তিনি ঐ বিষয়টা বেশ কোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তিনি বোল্‌ছিলেন,—

মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারন্তু যোগিনা পীতম্ তক্রং পিবতি পণ্ডিতঃ॥

চারি বেদ এবং সর্ব্ব শাস্ত্র মন্থন করিয়া তাহার সারভাগ যোগিগণ পান করিয়াছেন এবং পণ্ডিতগণ ঘোল খাইতেছেন।

এই কথা শুনে, আমি তন্ত্রবাগীশ্ প্রভুর সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া, কহিলাম যে, প্রভো! আপনি যে কথা বোল্‌ছিলেন, ঐ কথা শুনে আমার বড় বিস্ময় জন্মেছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ কথার নিগূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া, আমার বিস্ময় দূর করুন। আপনি বোল্‌ছিলেন যে, চারি বেদ ও সর্ব্ব শাস্ত্র মন্থন করিয়া যোগিগণ সারভাগ পান করিয়াছেন আর পণ্ডিতগণ ঘোল খাইতেছেন; হে প্রভো!

যোগীতে ও পণ্ডিতে এরূপ প্রভেদ কিসে হইল? আপনার মুখেই তো সে দিন শুনিয়াছি যে,—

সর্ব্বচিন্তাপরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগি উচ্যতে।

সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হওয়াকে যোগ বলে।

আবার বশিষ্ঠ দেবও বোলেছিলেন,—

মনঃপ্রশমনোপায়ো যোগ ইত্যভিধীয়তে।

মনঃশান্তির উপায়কে পণ্ডিতেরা যোগ বলেন।

আরও সে দিন নারদ মহাত্মার মুখে শুনেছি যে,—

যেন সর্ব্বং পরিত্যক্তং স বিদ্বান্ স চ পণ্ডিতঃ।

প্রভো! দেখুন আপনারাই সিদ্ধান্ত কোরেছেন যে, যিনি চিন্তা ত্যাগ ও যিনি মনঃশান্তির উপায় কোরেছেন, তিনিই যোগী, আর যিনি এই জগৎপ্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই পণ্ডিত; তা হোলে যোগী ও পণ্ডিতে প্রভেদ কি? পাগলের বিবেচনায় যোগী অপেক্ষা বরং পণ্ডিত আরো উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তি, তাহাতে আর সন্দেহ হয় না। তবে যোগিগণ সারভাগ খেয়েছেন ও পণ্ডিতগণ ঘোল খাইতেছেন, আপনার মুখ হইতে এরূপ অসঙ্গত বচন ক্যানো নির্গত হইল? গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া, এ পাগলের মনকে পরিতৃপ্ত করুন; পাগলের মন-তৃপ্তির ঔষধ, আপনাদের কাছে ভিন্ন আর কারু কাছে নাই।

তত্ত্ববাগীশ প্রভু আমার প্রতি কৃপাকটাক্ষ করিয়া কহিলেন, পুত্র! তুমি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার প্রতি বিশেষ তুষ্ট হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, তোমার পাগল-অভিমান নিরাকৃত হইয়া, তুমি অচিরাৎ পাগল-পদবীতে পদার্পণ কর।

আমার বচনে যে, 'পণ্ডিত' শব্দ আছে, তাহার অর্থ দেবর্ষি নারদ মহাত্মার উল্লিখিত পণ্ডিতগণকে বুঝায় না. নারদ মহাত্মার উল্লিখিত পণ্ডিত, যোগী অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর নহেন, বরং উচ্চ শ্রেণীর

বলিতেও মনের সঙ্কোচ হয় না। ঐ বচনের পণ্ডিত শব্দের অর্থ, কেবল যাঁহারা ভাষা এবং শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া ঐ শাস্ত্রব্যবসায়ের দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, কেবল জীবিকা নির্ব্বাহাদি কার্য্য করেন, এবং 'আদান-আদান' শব্দ ভিন্ন, ত্যাগ করা দূরে থাকুক, ত্যাগের নামটীও মুখে আনেন না, সেই সকল পণ্ডিতগণকে বুঝায়; ঐ সকল পণ্ডিতকে মোটা পণ্ডিত বলে; আমার বচনের পণ্ডিত শব্দে ঐ মোটা পণ্ডিত। আর দেবর্ষির উল্লিখিত পণ্ডিতগণ সূক্ষ্মদর্শী সক্ পণ্ডিত। বাপু হে! আমার বচনটির আসল তাৎপর্য্য এই যে, সরু পণ্ডিত ও যোগিগণ, বেদ ও শাস্ত্রের সার ও সূক্ষ্ম অর্থ গ্রহণ করেন, ও মোটা পণ্ডিতগণের ঐরূপ সূক্ষ্ম অর্থ গ্রহণ করিবার শক্তি নাই, কাযে কাযেই তাঁহারা অসার ভাগ খোল স্বরূপ মোটা অর্থ গ্রহণ করেন।

তন্ত্রবাগীশ প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিয়া আমার মনের ধাঁধা দূর হোলো, এবং জানলুম যে, শাস্ত্রের অর্থসকল দুই প্রকার,—স্থূল ও সূক্ষ্ম; এবং যাঁহার যেমন অধিকার, তিনি সেইরূপে ও সেই ভাবে অর্থ গ্রহণ করিতে সক্ষম হন।

বিশে:—ক্ষেপা দিগম্বর ঠাকুর যে, সে দিন আমাকে কেবল নিঃসঙ্গ হোতে বোলেছিলেন, তা নয়, তিনি আর একটা কথা বোলেছিলেন,—

দুঃখমূলং হি সংসারং স যস্যাস্তি স দুঃখিতঃ।
তস্য ত্যাগঃ কৃতো যেন স সুখী নাপরঃ প্রিয়ে॥

কু, তন্ত্র।

সংসারই দুঃখের মূল; যাঁর সংসার আছে, তিনিই দুঃখী এবং যিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই সুখী, অন্যে নহে।

তাই তোকে জিজ্ঞাসা কোর্‌চি, ভাই! সংসার কি? এবং সংসারই দুঃখের মূল কেন? দুঃখই বা কি? আর এই সংসার কি ত্যাগ কোর্‌তে পারা যায় না?

দিশে:—ভাই! তুই যা জিজ্ঞাসা কোর্‌লি, একথা পাগলের

জিজ্ঞাসা কর্‌বার কথাই বটে; এ সব কথা পাগলের মনে বৈ আর কারু মনে তো ওঠে না; আর পাগলই এ কথার উত্তর দিবার যোগ্য পাত্র। কেননা পাগল তো একটা গাছের ফল নয়, কেবল ঐ সব কথা ভাবতে ভাবতেই পাগল হয়, অতএব ঐ সম্বন্ধে, যা কিছু বোল্‌তে পারে, তা পাগলেই পারে; কেননা পাগল ভেবে ভেবে মনে যেটা স্থির করে, তাই বোলে ফ্যালে, মনের কথা প্রকাশ কোরতে পাগলের ভয় ও লজ্জা হয় না।

ঐ সম্বন্ধে এ পাগলের মনের কথা এই যে, বাসনাই সংসার। আটবাঁকা ঠাকুরও তাই বলেন,—

বাসনা এব সংসার ইতি সর্ব্বা বিমুঞ্চতা।
তত্ত্যাগো বাসনাত্যাগাৎ স্থিতি রদ্য যথা তথা॥

বাসনাই সংসার, অতএব তুমি সমুদায় বাসনাই ত্যাগ করিবে। বাসনা ত্যাগ হইলেই সংসার ত্যাগ হইবে, পশ্চাৎ তুমি, যেরূপে হউক, অবস্থান কর।

আর ঐ বাসনার মূলই সুক্ষ্মেন্দ্রিয় মন, মন হইতে নানা প্রকার বাসনা জন্মে, এবং বাসনা হইতে ভোগতৃষ্ণা, আশা, স্পৃহা ও আসক্তি প্রভৃতি উদ্ভূত হয়; এবং ভোগতৃষ্ণা ও আশাদির স্বভাবই এই যে, তাহারা ক্রমিক বলবতী ভিন্ন ক্ষীণ হোতে চায় না, আর সেই বাসনাদির ধর্ম্মই এই যে, তাহারা অনবরত মনকে চঞ্চল করে, এবং মুহূর্ত্তের জন্যও মনকে তুষ্টি, কি শান্তি, লাভ করিতে দেয় না; মনের ঐ চঞ্চলতাকেই দুঃখ বলে। সুতরাং ঐ বাসনারূপ সংসারকেই উক্ত দুঃখের মূল বোল্‌তে হোচ্চে।

ঐ সম্বন্ধে মনু ঠাকুর বলেন যে,—

আশা বলবতী কষ্টা নৈরাশ্যং পরমং সুখম্।

আবার আটবাঁকা ঠাকুরের উক্তি—

তৃষ্ণামাত্রাত্মকো বন্ধো তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে।
ভবাসংসক্তিমাত্রেণ প্রাপ্তিতুষ্টি মুর্হুমুর্হুঃ ॥

আর এই সংসারকে ত্যাগ কোর্‌তে পারা যাবে না ক্যান? একটু আয়াস স্বীকার কোর্‌লেই পারা যায়। তা কোর্‌তে গেলে আগা ধোর্‌লে হবে না, একেবারে গোড়া ধোর্‌তে হবে।

তা হোলে বাসনা অর্থাৎ সংসার দুঃখের মূল হোচ্চে, এবং মনই ঐ সংসারের মূল, সুতরাং মনকে বিনাশ কোর্‌তে পার্‌লেই সংসার ত্যাগ করা হয়।

নিশেঃ—ভাই! মনকে আবার বিনাশ করা কি? আর মনতো দেহের মধ্যে আছে, তা দেহ বিনাশ না কোর্‌লে মন কিরূপে বিনষ্ট হবে?

এ বড় আশ্চর্য্য! তা ভাই! এটা তোর ঠিক পাগলামির কথা।

দিশেঃ—আমি তো পাগলই, সহজ মানুষ নই; তা আমার কথা পাগলামির কথা হবে না তো, কি, সহজ মানুষি কথা হবে। তা ভাই! কিছু মনে করিস্‌নে, প্রথম কথাটা ঠিক গুলিখোরের কথার মত লাগ্‌বে। যদি মানুষের পেটের মধ্যে একটা ছেলে থাকে, তা হোলে ঐ মানুষটাকে না মেরে কি, ঐ ছেলেটাকে মারা যায় না? নানা উপায়ে পারা যায়। তার মধ্যে মোটা মুটি একটা গুলিখোরি উপায়,—আচ্ছা কোরে পেটে কোসে একটা লাথি মার্‌লেই ছেলের দফা নিশ্চিন্তি, ওমনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, মানুষটা তো মরে না, তবে দুদিন দশ দিন কষ্ট পায়। আরও তো, চিত্তের মূল আছে। মুনি ঠাকুররা আবার চিত্তে বিশ্রাম কোর্‌তে পার্‌লে মুক্তি হয় বলেন।

আসল কথা মনের চঞ্চলতাহীন হওয়াকে মনের মৃত্যু বলে।

বশিষ্ঠ দেবও ঐ সম্বন্ধে বোলেছেন,

যত্তু চঞ্চলতাহীনং তন্মনো মৃত উচ্যতে।

যো, বা, উৎ, প্র।

চঞ্চলতাহীন মনকেই মৃত মন বলে।

অতএব মনের চঞ্চলতা নিরাকরণ কোর্‌তে পার্‌লেই মনকে মারা যায়। তুই তো নেহাত পাগল, একটু লক্ষ্য কোরে দেখ্‌লে, তুই আপনা-আপনিই বুঝ্‌তে পার্‌তিস্‌। কেননা তোর মন রোজই মরে, আবার রোজই বাঁচে।

দেখ্‌ মানুষের তিনটী অবস্থা,—জাগ্রৎ, স্বপ্ন আর সুষুপ্তি। তার মধ্যে জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় মন সকাম থাকে, ও সুষুপ্তি অবস্থায় নিষ্কাম এবং চঞ্চলতাহীন হয়; এইটুকু তো মন লাগিয়ে দেখ্‌লেই আর ভ্রম থাকে না। তবে মনের ঐ রূপ মরণ অল্পকাল স্থায়ী, কিন্তু যোগসাধনা ও অভ্যাসের দ্বারা মনকে ঐরূপ অবস্থাপন্ন ও তাহা দীর্ঘকালস্থায়ী কোর্‌তে পারা যায়; তাকেই মুনি ঠাকুররা যোগ-সমাধি বলেন। তা হোলেই তো দেহ জীবিত থাকে ও মন লয়-প্রাপ্ত হয়।

তবে ঐরূপ মন মারা সহজ মানুষের কায নয়, যদি কেউ মন মার্‌তে পারে, তো পাগলেই পারে, ও যদি কেউ মেরে থাকে, তো, পাগলেই মেরে থাক্‌বে; কেননা পাগলের ভয় নাই, লজ্জা নাই, সময়েরও অভাব নাই; শত্রুবধ করাই তার ব্যবসা। আবার এ দিকে পাগলের সাত খুন্‌ মাপ্‌. পাগল যদি খুন্‌ করে, তবে সে যতদিন পাগল থাকে, ততদিন (এখনকার) রাজার কাছেও তার ঐ দোষের বিচার হয় না; তবে পাগল ঘুচ্‌লেই বিপদ, সবদিকেই বিপদ! আর সহজ মানুষেরা মন মার্‌তে পার্‌বে ক্যানো? তাতে, তাদের দোষ নাই; তারা আপন-আপন মাগ্‌ ছেলে ও ধন সম্পত্তি ও কামের বাগান নিয়েই ব্যস্ত, তাদের মাথা চুলকোবার অবকাশ নাই; তা তারা ওসব বিষয় ভাব্‌বে কখন? তাদের ঐ নেশা একেবারে বুঁদ হোয়ে আছে। পাগলের রুষ্ট তুষ্ট বোঝা যায় না।

নিশেঃ—ভাই! তুই যোগ সাধনা ও অভ্যাস বোল্লি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, উপাসনাটা কি?

দিশেঃ—ওটা বড় লম্বা কথা, তবে আমি চুম্বক কথাতেই বোলবো, বেশী কথা আর পাগলকে ভাল লাগ্‌চে না। আমি আগে

বোলেছি যে, যোগসাধনা ও অভ্যাসাদি যেমন মন ছেদনের অস্ত্র, তেমনি মন নানা দিকে ছুটে বেড়ায় বোলে, উপাসনাদি ঐ মন ধরবার ফাঁদ ; আগে না ধোর্‌তে পার্‌লে ত মারা যায় না।

প্যাগলের মনে আর একটা কথা উঠ্‌লো! তন্ত্রে যে দেবীপূজার নানাবিধ বলিদান দিবার বিধি আছে, তার মধ্যে নরবলিই শ্রেষ্ঠ বলি ; ঐ নরবলিকেই বৈদিক মতে মন বিনাশ বলে, আর তন্ত্রমতে নরবলি বলে। তবে তন্ত্রমতে ঐ বলিদানের অনেক গুলি কার্য্যানুষ্ঠান কোরতে হয়, আর বৈদিক মতে কেবল যোগ সাধনা ও অভ্যাসের দ্বারা মন বিনাশ কোর্‌তে পারা যায়।

নিশেঃ—নরতো মানুষের শরীর আর মনতো শরীর নয়, তবে মন বিনাশকে কি কোরে নরবলি বোল্‌বে ?

দিশেঃ—ক্যানো, মনও তো শরীর, তা কি তুই শুনিস্ নাই ? সেদিন বশিষ্ঠ দেব বোলেছিলেন,—

> সর্ব্বএব জগত্যস্মিন্ দ্বিশরীরাঃ শরীরিণঃ।
> একং মনঃশরীরন্তু ক্ষিপ্রকারি চলং সদা।
> অকিঞ্চিৎকরমন্যত্তু শরীরং মাংসনির্ম্মিতম্॥
>
> এই জগতে সকলেরই দুই শরীর—এক শরীর মন ও অন্য এক শরীর মাংস নির্ম্মিত স্থূল শরীর, মন ব্যতিরেকে স্থূল শরীর কোন কাযের নয়।

তা হোলে আপনার মন বিনাশ করাকেই যে নরবলি বলে, তাতে আর সন্দেহ হোচ্চে না, কেননা, তন্ত্রে যে দেবীপূজার পদ্ধতি আছে, তাহা যিনি যে ভাবেই করুন না ক্যানো, আসল উদ্দেশ্য কেবল মুক্তি লাভের জন্য ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। মূলকার্য্য প্রথমতঃ দেবীরূপ কল্পনা কোরে, তাঁর উপাসনা ও পূজাদি দ্বারা মনের একাগ্রতা কোর্‌তে পার্‌লেই জ্ঞান জন্মে, ও ঐ জ্ঞানের দ্বারা প্রথমে ছাগ মেষাদি রূপক কোরে, বলিদান স্বরূপ অবিদ্যা নাশ করিয়া,

পরিশেষে নরবলিরূপ মনকে বিনাশ কোর্‌তে পার্‌লেই মুক্তিলাভ হয়। তা নৈলে কতকগুলো পশু ও নর হত্যা করা যে মুক্তির কারণ, এবং তাতেই যে দেবী তুষ্ট হোয়ে বর দেবেন, তাহা ক্ষেপা ঠাকুরের বল্‌বার উদ্দেশ্য নয় এবং শাস্ত্র ও যুক্তি মতে তাহা সম্ভবও হয় না। তবে সহজ মানুষেরা আপন ইচ্ছামত সবই ভেবে নিতে পারেন, এবং সকলই কোর্‌তে পারেন, তাঁদের অসাধ্য কিছুই নাই।

আমি আগেই তো বোলেচি যে, যাঁর যেমন অধিকার, তিনি তেমনি অর্থ গ্রহণ কোরতে সক্ষম হন। ফলে পাগল তো সহজ মানুষ নয় যে, সে মুক্তির জন্য পশু ও মানুষ বধ করবার চেষ্টা কোর্‌বে? সে, তা কখনই কোর্‌বে না; সে মুক্তিজন্য জ্ঞান উপার্জ্জন দ্বারা অবিদ্যা ও মনকে বিনাশ করবার সাধনা ও অভ্যাস কোর্‌তে চেষ্টা কোর্‌বে, এতে পাগল ঠকুক্ই আর জিতুক্ই।

তৃতীয় কারখানা।

এদিকে সূর্য্য দেব অস্ত গেলেন, সন্ধ্যা উপস্থিত, রজোগুণও কিছু শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। দিশে ও নিশে, আগামী প্রাতে ঐ স্থানে 'জোট্‌বার কথাবার্ত্তা' স্থির কোরে, দুজনে প্রস্থান করিল। নিশে প্রাতে সেই নদীতে স্নান কোরে, নিরূপিত বটতলায় উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, দিশেতো তখনও আসে নাই, সুতরাং একলা সেই বৃক্ষমূলে একটি মনোরম্য স্থান নির্ণয় করিল।

ঐ স্থানটীর উপরিভাগ বৃক্ষের শাখাপ্রশাখার দ্বারা এরূপ আচ্ছাদিত হইয়াছে যে, ঠিক যেন মোছলমানদের মসজিদের একটি গুম্বুজ; এবং ঐ শাখাপ্রশাখা সকল অতিশয় ঘন, ও তদ্দ্বারা স্তরে স্তরে জোড়ের জায়গাসকল এপ্রকার ঢাকা পড়িয়াছে যে, বর্ষায় বৃষ্টিতে নীচে বিন্দুমাত্র জল পড়ে না, ও রৌদ্রের তাপ লাগে না ; এবং

চতুর্দ্দিকে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দূরে বৃক্ষশ্রেণি-সমূহ স্থানটীকে এরূপ বেষ্টন করিয়াছে যে, মানুষে বহু অর্থ ব্যয়, ও যত্ন করিলেও, বাটীর ঐরূপ মনোরম্য প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে পারে না। আবার ঐ বৃক্ষ-শ্রেণীতে মাধবী, ঝুমকা, ও তরুলতা এরূপ ঘন হইয়া উঠিয়াছে যে, সহজে তীর প্রবেশ হয় না, কিন্তু মধ্যে মধ্যে ও স্থানে স্থানে লতা-সকলের ভাব ও গতি এ প্রকার যে, স্থানে স্থানে একটু একটু এরূপভাবে ফাঁক আছে যে, দেখিলেই মনে উদয় হয় যেন, ভিতরে বাতাস যাবার জন্য বিশ্বকর্ম্মা মিস্ত্রী পাঁচিলের মাঝে মাঝে এক একটী জাফরি করা জানালা বোসিয়ে দিয়েছেন; এবং পূর্ব্বদিকে অতি অল্প পরি-মাণ স্থানে ঐ বৃক্ষশ্রেণীর নিম্ন ভাগ সংলগ্ন হয় নাই, কিন্তু উপরি-ভাগে উভয় দিকের সুবিস্তৃত শাখা প্রশাখা সকল সম্পূর্ণ সংলগ্ন হওয়াতে কোন স্থানেই ফাঁক নাই; যেন ভিতরে গমনাগমনজন্য ঐ স্থানটী দ্বারদেশস্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। আর ঐ অসংলগ্ন স্থানের দুই দিকের বৃক্ষে ও উপরে লতাসকল যে ভাবেও যে গতিতে উঠিয়াছে, তাহা মুখে বলিয়া প্রকাশ করা যায় না; দেখিলে মনে একটী অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়া, কেবল এক পরমেশ্বর নিত্য আর সমস্ত বস্তুই ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান হয়, * এবং কোন বিষয়েই আস্থা ও ভোগবাসনা থাকে না; † এবং ইহাতে মনে আরও একটী ভাবের উদয় হয় যেন, সংসারকে ভিতরে প্রবেশ করিতে না দিবার জন্য বিবেক ও বৈরাগ্য মূর্ত্তিমান হইয়া দ্বার রক্ষা করিতেছেন।

আর দক্ষিণ দিকে ঐ বৃক্ষশ্রেণীর অনতিদূরেই, একটী ছোট নদী পূর্ব্বমুখে প্রবাহিত হইয়াছে, যদিও নিদাঘ কালে জলের যোগ থাকে না, স্থানে স্থানে অল্প অল্প জল থাকে, কিন্তু যে স্থানেই হউক, একটু বালি সরাইয়া অল্প গর্ত্ত করিয়া দিলেই, অল্প কালের মধ্যেই

---

* এক ঈশ্বর নিত্য, তদ্ভিন্ন সমস্ত বস্তু ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান হওয়াকেই বিবেক বলে।

† কোন বস্তুতেই আস্থা ও ভোগবাসনা না থাকাকেই বৈরাগ্য বলে।

এ গর্ত্ত জলে পরিপূর্ণ হয়; এবং ঐ জল এরূপ নির্ম্মল ও স্নিগ্ধ যে, কলিকাতার কলের জলের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট, ঠিক্ যেন বাঁকুড়ার নীচে গন্ধেশ্বরী নদীর জল।

নিশে ঐ স্থানে কতকগুলি পত্র আহরণ করিয়া দুইটি আসন প্রস্তুত ও স্থাপন করতঃ তন্মধ্যে আপনি একটী আসনে বসিয়া এইরূপ চিন্তা কোর্‌তে লাগ্‌লো যে, দিশে তো এখনও এলো না, তবে আমি দিশে-হারা হবো নাকি? না, তা হবো না, কাল্ তার সঙ্গে যেরূপ খোলাখুলি হোয়েচে, তাতে গোঁ, সে আমাকে ছাড়্‌বে বোলে বোধ হয় না; তা তার ছাড়বারই বা যো কৈ, তাতে আমাতে তো ভেদ নাই, মধ্যে একটু ধাঁধা বৈত নয়! যা হোক্, এই স্থানেই দুজনে একত্রে বাস কোর্‌বো, আর কোথাও যাবো না, এই স্থানেই পাগলের সব মসলা যোগাড় কোরবো, এবং শেষে পাগল হোয়ে, পাগলামি ব্রত উদ্‌যাপন কোরে নিশ্চিন্ত হোয়ে বোস্‌বো। নিশু এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় পূর্ব্বদিকে পায়ের শব্দ হইবায় দেখিল যে, দিশে আসিতেছে, দেখিয়া মনে বড় আহ্লাদ হইল। দিশে দ্রুত পদে আসিয়া নিশেকে প্রণাম কোরে, পায়ের ধূলো, নিয়ে কহিল, দাদা! আমার অপরাধ মাপ কর, আমার একটু দেরি হোয়ে গ্যাচে, ভাই! আমি একটা বিপদে পোড়েছিলাম। কাল্, ভাই। সেই তোর কাছ থেকে গেলাম। ও—ই গ্রামে একটী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীর কাছে আমার একখানি চালা আছে, আমি সেই চালাতেই থাকি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বয়স প্রায় আশী, ব্রাহ্মণীও তেম্‌নি, যজমান শিষ্য বিলক্ষণ আছে, সহজ মানুষের দলে তিনি একজন বেশ সুসারি। তবু এখনও লাভের জন্য তিনি যাজ্য ক্রিয়া করিতে ও শিষ্য বেড়াইতে ত্রুটি করেন না, ঐ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আমাকে বড় ভাল বাসেন। তাই কাল্ রাত্রে গিয়ে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বোল্লাম যে, ঠাকুর! আমি এক মনের মানুষ পেয়েচি, তা কাল্ থেকে, বোধ হয়, তার কাছে যাবো, আর আসবো না, সে মনের মানুষ ছেড়ে আমার আর থাকবার যো নাই। ভট্টাচার্য্য মহা-

শয় বোল্লেন, সে কি রে দিশে!—তুই পাগল হোয়েছিস্ না কি? আমি বোল্লাম, না, মহাশয়! পাগল তো হই নাই, তবে হবার চেষ্টা কোর্‌চি। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বোল্লেন, না, তোর যাওয়া হবে না, আমি তোকে ছেড়ে দেবো না, তুই আমার সঙ্গে যজমান শিষ্য বাড়ী যাবি, ও আমার বাড়ীতে খাবি, আর মধ্যে মধ্যে শিষ্য যজমানের বাড়ীতেও কিছু কিছু পাবি। আমি বোল্লাম, ঠাকুর! দিশে খেতেও চায় না, পয়সাও চায় না, আপনাকে যে দিশে লেগেচে, তা না ছাড়্‌লে তো, আপনি এ দিশেকে রাখ্‌তে পার্‌বেন না; যদি আপনার ওদিশে কখন ছাড়ে, তা হোলে এ দিশেকে পাবেন। তখন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বোল্লেন যে, দিশে অনেক দিন ছিল, ওকে একটু মায়া হোয়েচে, এজন্য একবার একবার মনটাও কেমন করে তা ওর যে রকম দেখ্‌চি, তাতে ও আর থাকে না। তা তুমি তো সেই বশীকরণ, না, কি, জান তো, তবে তাই কোরে দিশেকে রাখনা কেন? আমি বোল্লাম, কি ঠাকুর! আপনি বশীকরণ জানেন নাকি? ঠাকুর বোল্লেন, হাঁ, আমি তন্ত্রমতের কার্য্যের দ্বারা লোককে বধ, বশ ও উচ্চাটন কোর্‌তে পারি, তাকেই তন্ত্রের বশীকরণ, মারণ ও উচ্চাটন্ বলে। আমি বোল্লাম ঠাকুর! আপনি এ সব কোথায় শিখলেন? ঠাকুর বোল্লেন, ক্যানো, আমার অধ্যাপকের কাছে। আমি বোল্লাম, তন্ত্রে যে মারণ, উচ্চাটন ও বশীকরণ যোগের পদ্ধতি আছে, তা, আপনার অধ্যাপক কি অন্য লোককে ঐরূপ মারণ, উচ্চাটন ও বশীকরণ করা, তন্ত্রের এইরূপ অর্থ আপনাকে বোলে দিয়েচেন না কি? ঠাকুর বোল্লেন, হাঁ। আমি তখন বোল্লাম যে, তবে আপনার অধ্যাপক মোটা ভট্টাচার্য্য; তাই আপনাকে ঐ রূপ মোটা অর্থ বোলে দিয়েচেন। তখন ঠাকুর বোল্লেন যে, তবে ইহার কোন সরু অর্থ আছে না, কি? আমি বোল্লাম, আচে বৈ কি, তবে বোলি, শুনুন।

তন্ত্রমতের উচ্চাটন্ যোগ। মনোমধ্যে বিবেক সাধনা করিতে হয়, যাতে কোরে কেবল এক ঈশ্বর ভিন্ন সমস্ত বস্তু মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান হয় তখন আর কোন বিষয়েই আস্থা থাকে না, সুতরাং

সংসারে আর থাকতে ইচ্ছা হয় না, মন সর্ব্বদা ছট্ ফট্ করে; তাহাকেই উচ্চাটন যোগ বলে।

বশীকরণ যোগ। যে সাধনার দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া আয়ত্তাধীন করা যায়, তাহাকেই বশীকরণ যোগ বলে।

মারণ যোগ। যে যোগ সাধনার দ্বারা মনের চঞ্চলতা দূর করিয়া মনকে বিনাশ করিতে পারাযায়, তাহাকেই মারণ বলে।

তা নৈলে লোকের মেয়ে, ও হাকিম বশ করবার, ও যার সঙ্গে বিষয় লইয়া বিবাদ হবে, তাকে মারবার জন্য কি ক্ষেপা ঠাকুর তন্ত্রে মারণ, বশীকরণ ও উচ্চাটন যোগের পদ্ধতি কোরেচেন না কি? এ কথা মোটা ভট্টাচার্য্যরা এবং তাঁদের উপদেশ মতে সহজ মানুষেরাই বিশ্বাস কোরতে পারেন, পাগলের মনে এ কথা কোন মতেই স্থান পায় না।

তখন ঠাকুর বোল্লেন, যাই হোক্, রে বাপু! আর ক্ষেপামো কোরিস্ না, আমরা ভট্টাচার্য্য মানুষ, ও ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী, আমার কাছে থাক্লে তোর সব দিকেই ভাল হবে। আমি বোল্লাম, ঠাকুর মহাশয়! একটা কথা আমাকে বুঝিয়ে দিন্? আপনি বোল্লেন যে, আমরা ভট্টাচায্য মানুষ; তা, আপনার মানুষ কোন্ খানটা বলুন দেখি, তা বোল্লেই দিশে আপনার সঙ্গে থাক্বে।

তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বোল্লেন, বাপ্ রে! দিশে তো সহজ মানুষ নয়। আচ্ছা বাপু! তুমি যাও, তবে মাঝে মাঝে যদি এক এক বার আমার কাছে আসো, তাহোলে আমি বড় তুষ্ট হবো।

তাই, ভাই! শুতে অনেকটা রাত হওয়ায় উঠ্তে একটু বেলা হোয়েছিল, এই যেবেই তাড়া তাড়ি কোরে আস্চি; তাতেই একটু দেরি হোয়ে গ্যাচে।

নিশেঃ—তা বেশ, একটু দেরি হয়েচে, তার আর হবে কি? আর আমিও কাল্ বেতে যা দেখেছিলাম, তা এর পর তোকে বোল্বো; এখন তুই বোস্, তোর জন্য এই আসন তৈয়ার কোরে রেখেচি।

দিশু বস্লো।

আচ্ছা, ভাই, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুই যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা বল্লি, তিনি কি জ্ঞানী পণ্ডিত?

দিশেঃ—ভট্টাচার্য্য মহাশয় ব্যাকরণ বেশ জানেন, কেবল জানা নয়, ব্যাকরণে তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি আছে; স্মৃতি শাস্ত্রেরও অনেক গ্রন্থ পোড়েচেন। বুদ্ধি অতি প্রশংসনীয়, তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম। তবে তিনি জ্ঞানী কি না, তা আমি কেমন কোরে বোল্‌বো? তবে এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে পারি যে, মানুষের যে সাধারণ জ্ঞান হয়, তা তাঁর আছে। কিন্তু যেদিন আটবাঁকা ঠাকুর জনক রাজাকে বোল্‌ছিলেন যে,—

মুক্তিমিচ্ছসি চেত্তাত বিষয়ান্ বিষবত্ত্যজ।"

যদি মুক্তি চাও, তবে বিষয়সকল বিষের ন্যায় ত্যাগ কর।

আবার শঙ্কর ঠাকুর বোলেছিলেন,—

কিমত্র হেয়ং? কনকঞ্চ কান্তা।

কোন বস্তু হেয়? ধন ও স্ত্রী।

এতে কোরে ঐ মুনিঠাকুরদের মতে যে সকল বস্তু হেয়, আমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ঐ সকল বস্তু পরম উপাদেয়; এতেই এক এক-বার বোধ হয় যে, তিনি একজন বিশিষ্ট মোটা পাগল। তবে সরু ও সরু পাগল যে কি, তা তিনি বেশ বুঝ্‌তে পারেন; এবং অভিমানটীও বিলক্ষণ আছে। যদি কেউ সরু পাগল হবার চেষ্টা করে ও তাঁহার সঙ্গে ঐ সম্বন্ধের কথা বার্ত্তা কয়, তা হোলে তিনি ওমনি তাকে বলেন যে, বাপু রে! যদিও ঐ সকল কায্ হিতকর বটে, কিন্তু তা হবার নয়, ও সব কায্ বড় দুষ্কর, ও বিষয়ের চেষ্টা কোরো না, ও সব কি হোয়ে ওঠ্‌বার যো আছে?

কিন্তু সেদিন বশিষ্ঠ দেব বোলেছিলেন যে,—

স্বায়ত্ত মেকান্তহিতং স্বেপ্সিতত্যাগবেদনম্।
যস্য দুষ্করতা যাতা ধিক্ তং পুরুষকীটকম্॥

স্বাধ্যাধীন অথচ অত্যন্ত হিতকর যে স্পৃহাত্যাগজনিত ব্যথা উপস্থিত হয়, তাহা যে পুরুষকে দুষ্কর বলিয়া বোধ হয়, সে পুরুষ কীট ও তাহাকে ধিক্!

এতেই, ভাই! বুঝে লওনা যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় জ্ঞানী এবং পণ্ডিত কি না?

নিশ্চেঃ—প্রবৃত্তিসমাজের প্রায় সব লোকই ঐ রকম, মোটা ধনে (বিষয়ে) সকলেরই প্রবৃত্তি, সরু ধনে (তত্ত্বজ্ঞানে) কারু রুচি হয় না, এবং সে তত্ত্বও কেউ করেন না। সহজ মানুষেরা প্রায় কেউ আসল্ কায্ করেন না, নেসার ঘোরে সকল কাযের অভিনয়ই করেন। নাটক অভিনয়কারিগণের তো অভিনয় আরম্ভ ও তার শেষ হবার একটা সময় আছে, কিন্তু এদের অভিনয়ের আর শেষ নাই; ক্রমিক এক্শা চোল্‌চে, আবার 'একুসা'ও চোল্‌চে। ও অভিনয় আর ভাঙ্গে না এবং ভাঙ্গাবারও নয়। তাঁদের বাসনা, স্পৃহা, আসক্তি ও তৃষ্ণা এরূপ বলবতী যে, মোর্‌লেও ভাঙ্গতে চায় না। ওমনি পুনঃজন্মের কল্পনা কোরে বলেন যে, এ জন্মেত বাসনা পূর্ণ হোলো না এবং হবারও উপায় দেখ্‌চিনে; ভাল দেখা যাক্, যত দূর পারা যায়, করা যাক্, নিতান্তই না হয় তো, যা কোরে হোক্, আর জন্মে আশা পূর্ণ কোরবো; এইরূপে কেবল আসা যাওয়া কোরতে থাকেন। যদি তা না হোত এবং বাসনা, স্পৃহা ও তৃষ্ণা না থাকিত, তবে সকলেই কামনাশূন্য হইতেন, সুতরাং পুনঃজন্মের আর কল্পনা করিতে হইত না। যদি জগৎপ্রপঞ্চ ও সাকার সত্য বলিয়া জ্ঞান কর, তাহা হইলেই পুনঃজন্ম কল্পনা করিতে হয়; আর সাকার মিথ্যা ও নিরাকার সত্য বলিয়া উপদেশ দিতে হইলে, আর পুনঃজন্ম সম্ভব হয় না।

এই সম্বন্ধে আটবাঁকা ঠাকুর বলেন,—

সাকার মনৃতং বিদ্ধি নিরাকারন্তু নিশ্চলম্।
এতত্তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ॥

সাকার বস্তু মিথ্যা এবং নিরাকার সত্য বলিয়া উপদেশ দ্বারা পুনর্জ্জন্ম সম্ভব হয় না।

যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই পুনরুৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু যাহা মূলেই উৎপন্ন হয় নাই, তাহা আর পুনরুৎপন্ন হইতে পারে না। সুতরাং প্রবৃত্তি উৎপত্তির কারণ এবং নিবৃত্তিই লয়ের কারণ; ফলে ফলেই প্রবৃত্তি সাকার এবং নিবৃত্তিই নিরাকার। প্রবৃত্তির মৃত্যুই নিবৃত্তি, কিন্তু নিবৃত্তির আর মৃত্যু নাই।

তা হোলে দেখ এই জগৎপ্রপঞ্চ সত্য জ্ঞানে ভোগবাসনা থাক্‌লেই পুনঃজন্মের প্রয়োজন, আর ভোগবাসনা না থাক্‌লে পুনঃ-জন্মের প্রয়োজন হয় না।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে শুনেচি যে, সুরথ রাজা ও সমাধি বৈশ্য, দুই ব্যক্তি দেবী আরাধনা করিয়া আপন আপন কামনানুসারে এক ব্যক্তি রাজ্য ও অন্য ব্যক্তি মুক্তি, লাভ করিয়াছিলেন; তা হলেই যিনি রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার বন্ধন বৃদ্ধি হইয়া পুনঃজন্ম হইয়াছিল, ও যিনি মুক্তি কামনা করিয়াছিলেন, তাঁহার বন্ধন মুক্ত হওয়ায় পুনঃজন্ম নিবারিত হইয়াছিল। এতেই দেখা যায়, যেমন মন, তার তেমনি ধন; অর্থাৎ কারু পুনঃজন্ম হয়, কারু হয় না।

মোটা পাগলদের আর আসক্তি মেটে না, যদি তাঁদের পাগলামির উপকরণ পুত্র পৌত্রাদি বিষয়ের অভাব হয়, অমনি পুনঃজন্মে তাহা পাইবার জন্য একটী যজ্ঞ কি ব্রত আরম্ভ করেন, তা হোলেই বিষয়বাসনাজন্য যে পুনঃজন্মের কল্পনা করিতে হয়, তাহাতে আর সংশয় হয় না।

আবার একটা দুঃখের কথা এই যে, পরাশর ও মনু ঠাকুরের মুখে

শুনেছি যে, স্ত্রীলোক সধবা অবস্থায় পতিব্রতা, ও বিধবা হইলে সহমৃতা হওয়া এবং তদভাবে ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করা, তাহাদের ধর্ম্ম, অর্থাৎ জীবিত পতিকে সাকার ঈশ্বর, ও আপনাকে সেবক জ্ঞানে তাঁহার পরিচর্য্যাদির দ্বারা সাকার উপাসনা এবং মৃত পতির আত্মাকে নিরাকার ঈশ্বর, ও এরূপ সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ-জ্ঞানে নিরাকার উপাসনা করা, এই স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম এবং সেই জ্ঞানসিদ্ধিই তাঁদের মুক্তির কারণ। ইহাই দ্বৈতবাদ ধর্ম্মের মূল। কিন্তু প্রকৃত মোটা ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তো কেহই স্ত্রীলোকদিগে এ উপদেশ দেন না, তাঁরা কেবল সর্ব্বদা এই উপদেশ দেন যে, তুমি নানা প্রকার ব্রত কর, তাহোলেই পুনঃজন্মে রাণী হবে, ধন পাবে, পুত্র পাবে, যশ পাবে, ইত্যাদি। তা হবে না ক্যানো, পয়সা বড় জিনিষ।

এরূপ প্রলোভনে যদি কোন স্ত্রীর স্বামী নির্ধন ও কুরূপ হয়, তা হোলে তিনি ওমনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি, কি কোর্‌লে, ধনী ও সুশ্রী লোকের পত্নী হবো, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ওমনি একটা ব্রতের ব্যবস্থা কোরে দিলেন। তিনিও পুনঃজন্মে ধনী ও সুশ্রী পতি পাইবার আশায় এ ব্রত আরম্ভ করিলেন। আবার দুঃখের উপর দুঃখ, যদি তাঁর এই জন্মের পতি জীবিত থাকেন, তিনি ওমনি আমার স্ত্রী আর জন্মে রাজার স্ত্রী হবে, এই আহ্লাদে ঐ ব্রতের খরচ যোগাইতে লাগিলেন। ভাল! এই জন্ম ও পুনঃজন্ম কেবল দুদিন আগে, কি দুদিন পরে, এই বৈ ত নয়; তা হোলে দুদিন পরে একজন রাজাকে বিবাহ কোর্‌লে যদি ব্যভিচার আদি কোন দোষ না হয়, তবে এই জন্মে অর্থাৎ দুদিন আগে, ঐ রূপ বিবাহ কোর্‌লেই বা দোষ কি?

এ বিষয়ে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের মনের ভাব তাঁরাই জানেন। একথা বল্‌তে গেলে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ওমনি চিতেন ফিরোবেন; বোল্‌বেন যে, এই জন্মের পতিই পুনঃজন্মে রাজা ও সুশ্রী হবে, এবং ঐ স্ত্রী সেই স্বামীকেই বিবাহ কোরে রাণী হবে, অন্য স্বামী নয়।

তা হোলে দেখ, যদি ঐ স্ত্রীর শীঘ্র মৃত্যু হয়, ও স্বামী দীর্ঘ কাল

জীবিত থাকে, অথবা যদি স্বামী তপস্যা ও যোগ সাধনাদির দ্বার তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিলাভ করে. তা হোলে তার তো আর জন্ম হবে না, তখন কি হবে ? এখন হয়তো বোলবেন যে, ঐ স্বামীর তপস্যাদি পুণ্যফলে ঐ স্ত্রীরও আর জন্ম হবে না। তা হোলে ওর বিপরীত দিকে ঘোরলে কি বোলে বুঝোবেন ? তাঁরা স্ত্রীলোকদিগে বুঝান্ যে, স্বামীর পাপের ফল স্ত্রী ভোগ করেন না, কিন্তু পুণ্যের ফল ভোগ করেন ; আর স্বামী স্ত্রীর ব্রতাদি পুণ্যের ফল ভোগ করিতে পান না, কিন্তু পাপের ফল ভোগ কোর্ত্তে হয় ; তা হোলে ঐ স্ত্রী নানারূপ ব্রত করিল, এবং স্বামী অত্যন্ত পাপকার্য্যে রত হওয়ায় পরে তাহার তীর্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম হইল, তখন স্ত্রী ঐ স্বামী পাবে কোথায় ?

যা হোক্, ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের নিলে খেলা তাঁরাই বুঝেন্ ও সহজ মানুষদিগে বোঝান্ ;. পাগল তা বুঝ্‌বে ক্যান, সে তো সহজ মানুষ নয়।

ফল কথা, সহজ মানুষ (মোটা পাগলেরা) আসল কায্ করে না, তারা কেবল বাহ্যিক শান্তিরক্ষার যে সকল নীতি আছে, তাহাকেই ধর্ম্ম জ্ঞানে কার্য্য করে। এই তো পাগলের মনের কথা।

পুনঃজন্মসম্বন্ধে আরও একটা কথা বোল্‌তে হোচ্চে।--

সে দিন পতঞ্জলি ঠাকুর দুটী ছোট ছোট কথা বোল্লেন,—

জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃ সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ। ১

জাত্যন্তরপরিণামপ্রকৃত্যা পুরাৎ। ২

ভাই! আমি তো তাঁর ও-সব কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারলাম না। তবে তাঁর কাছে আর একজন রাজা * ছিলেন ; তিনিও যা বোল্লেন, তার ভাব খানা এই যে, পূর্ব্বজন্মের সাধনা ও অভ্যাস গুণেই ইহ জন্মে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। অতএব পূর্ব্বজন্মের

* "পাতঞ্জল দর্শনের" ভাষ্যকার শ্রীমহারাজাধিরাজ ভোজদেব।

অভ্যাসই সিদ্ধির কারণ। কিন্তু নন্দিকেশ্বরাদির পূর্ব্বজন্মের সাধনা ও অভ্যাস ব্যতিরেকে যে, ইহজন্মের সাধনার ও অভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধি লাভ হইয়া তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে কেবল প্রকৃতিবিকারে জাত্যন্তরপরিণাম পূরণ হইয়াছিল।

এই সকল কথার ভাবে বেশ বোধ হয় যে, প্রকৃতির বিকারে মানুষের যত অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়, ঐ সকল অবস্থাপবিবর্ত্তনকে এক এক জন্ম বলা যাইতে পারে। যেমন বাল্যাবস্থা হইতে বৃদ্ধাবস্থা এক এক জন্ম, তেমনি অজ্ঞানাবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে সমাধিপর্য্যন্ত জ্ঞানোন্নতি এক এক অবস্থান্তরকে জাত্যন্তর অর্থাৎ এক এক জন্ম বলিতে হইবে।

আর ইহজন্মেই তপস্যাদি কার্য্যসিদ্ধিতে, ক্ষত্রিয়াদি বর্ণসমূহ জাত্যন্তর অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে; যেমন বিশ্বামিত্র ঠাকুর হইয়াছিলেন।

আবার ব্রাহ্মণও কার্য্যের দ্বারা বর্ণান্তর হইতে পারে। সে সম্বন্ধে ভৃগুঠাকুর বোলেছিলেন যে,—

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মভি র্ব্বর্ণতাং গতঃ॥

আরও, সকল ঠাকুররাই বলেন যে, "ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ" ইহারও আসল তাৎপর্য্য যে, জ্ঞানই ব্রাহ্মণত্ব ও অজ্ঞানই শূদ্রত্ব।

এই সব দেখে শুনে বেশ বোধ হোচ্চে যে, পুনঃজন্ম হয়, আবার হয়ও না। আসল কথা, যা আগে বোলেচি যে, যেমন মন, তেমনি ধন, এবং যেমন মশলার গঠন, অর্থাৎ যেমন প্রকৃতি, তেমন কায্ ও তেমনি জ্ঞান।

আর বেশী কি বোল্‌বো, পাগলের এই বলা ঢের হোয়েছে।

ভাই! আর একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা কোর্‌তে ভুলে রোয়েছি, কাল্ রেতে সেই তোতে আমাতে এই বটতলা থেকে

গেলাম; বেলা যেতে আমি আরও একবার ঐ নদীর ধারে এসে, দেখ্‌লাম যে, একটা মানুষ একটা মড়ার বুকের উপর বোসে জপ্ কোর্‌চে। তা ভাই, সে ব্যাপারটা কি?

আর দেবদেবীর পূজা ও উপাসনা করার মূল উদ্দেশ্য কি?

আর দেবদেবীর কি প্রকৃত আকার আছে?

দিশেঃ—তুই যে মড়ার বুকে বসিয়া জপ করার কথা সুধুলি, তন্ত্রমতে শবসাধন বোলে একটা যোগ আছে, ঐ যোগ বড় শক্ত যোগ। সাধন ও অভ্যাস দ্বারা আপন জীবন্ত দেহকে শব অর্থাৎ মৃতদেহ জ্ঞানসিদ্ধি করাকেই শব সাধন বলে। তন্ত্রমতে ঐ সাধন করিতে হইলে, একটী পৃথক শব ও আরও অন্যান্য অনেক আনুষ্ঠানিক কার্য্যের ও দ্রব্যের প্রয়োজন হয়, কিন্তু বৈদিকমতে শবসাধন করিতে হইলে কেবল সাধনা ও অভ্যাস দ্বারা আপন জীবন্ত দেহকে, শব (মৃত দেহ) জ্ঞান সিদ্ধি করিতে হয়, আর তন্ত্রমতে শবসাধনে, একটা পৃথক শবের উপর বোসে আপন জীবন্ত দেহকে ঐ শবের তুল্য জ্ঞানসিদ্ধি করিবার সাধনা করিতে হয়, অর্থাৎ আপনার জীবন্ত দেহকে যে দেহের তুল্য জ্ঞান সিদ্ধ করিতে হইবে, ঐ দেহটী সাক্ষাৎকার থাকে। বৈদিক ও তন্ত্র মতে সাধনার মধ্যে প্রভেদ কেবল সাকার ও নিরাকার। তন্ত্র মতে শবসাধন, নরবলি ও মারণ, এই তিন কার্য্যে একই জ্ঞানসিদ্ধি ও একই ফল, লাভ হয়। ঐ তিন প্রকার সাধনার দ্বারা কেবল মনোবিনাশের জ্ঞান সিদ্ধি হয় মাত্র; ফলে একই ফল, কিন্তু কার্য্যপ্রণালী ও নাম পৃথক্ পৃথক্।

সে দিন আটবাঁকা ঠাকুর বোলেছিলেন,—

যদি দেহং পৃথক্ কৃত্বা চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি॥

যদি তুমি দেহকে পৃথক্ করিয়া চিন্মাত্রে বিশ্রাম কর, তাহা হইলে এখনি সুখী, শান্ত ও বন্ধনমুক্ত হইবে।

যদি সাধন ও অভ্যাস দ্বারা জীবন্ত দেহকে মৃত দেহ জ্ঞান সিদ্ধি, অর্থাৎ শবসাধনকে দেহ পৃথক্ করা না বলে, তবে আর কিরূপে দেহ পৃথক্ করা যাইতে পারে? দেহ পৃথক্ করার প্রকৃত অর্থই মনঃ বিনাশ করা।

আর সাকার ও নিরাকার বড় সূক্ষ্ম বিষয়, যদিও মুনি ঠাকুরদের কাছে আমরা এ বিষয়ের অনেক কথা শুনেচি, কিন্তু আমাদের এখনও ঐ বিষয়ের আন্দোলন করবার অধিকার হয় নাই। তবে এই পর্য্যন্ত বোল্‌তে পারি যে, সাকার অকুণ্ডের কুণ্ড, নিরাকারের আকার, ও নির্গুণের গুণ।

আর প্রকৃত পক্ষে দেব-দেবীর রূপও নাই, গুণও নাই, এবং বহুত্বও নাই, তবে উপাসকের সাধনার সুগমজন্য, দেব দেবী ও তাঁহাদের রূপ ও গুণ কল্পনা করা হইয়াছে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের কোন এক, কি ততোধিক গুণ সমষ্টিকে এক এক দেব কি দেবী এবং ঐ গুণ ও তাহার ক্রিয়ানুসারে ঐ দেব দেবীর রূপ কল্পনা করা হইয়াছে।

ঐ সম্বন্ধে ক্ষেপা ক্ষেপী এইরূপ বলাবোলি কোরছিলেন,—

ক্ষেপীর জিজ্ঞাসা,—

মহদ্‌যোনেরাদিশক্তের্ম্মহাকাল্যামহাদ্যুতেঃ।
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভূতায়াঃ কথং রূপনিরূপণম্।
রূপপ্রকৃতিকার্য্যাণাং সা তু সাক্ষাৎ পরাৎপরা।
এতন্মে সংশয়ং দেব বিশেষাচ্ছেত্তু মর্হসি॥

ম, নি, তন্ত্র।

ক্ষেপার উত্তর।

উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্॥

আর স্মৃতির একাদশী তত্ত্বে (রঘুনন্দন) স্মার্ত্ত বলেন, যথা—

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণোরূপকল্পনাঃ।
রূপস্থানং দেবতানাং পুংস্ত্র্যংশাদিককল্পনা॥

দেবদেবীর রূপকল্পনাসম্বন্ধে ক্ষেপা ক্ষেপী তো সব বোলেচেন এবং স্মার্ত্তের কথাতেও বিলক্ষণ প্রকাশ আছে। আমার আর বেশী বলবার প্রয়োজন নাই।

এখন এই বোলি যে, ফলে এ কথা, পাগলের কথা।—

বৈদিক মতে মুমুক্ষুত্ব (মুক্তিতে তীব্র ইচ্ছা) লাভ করিতে হইলে, বৈরাগ্যাদি সাধনচতুষ্টয় সাধন করিতে হয়, অর্থাৎ প্রথমতঃ এক ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্ত বস্তুই অনিত্য, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান সিদ্ধিতে বিবেক, এবং সকল বিষয়ে আস্থাত্যাগ হইয়া, বৈরাগ্য, ও শমদমাদি ষট্‌ক সম্পত্তি সাধনার দ্বারা মনোনিগ্রহ, এবং কর্ম্মত্যাগ আদি মনের একাগ্রতা সিদ্ধি হইলে, তবে মুমুক্ষুত্ব লাভ হয়। এই সমস্তই নিরাকারসাধনা ; কিন্তু সাধারণ জ্ঞানে ঐরূপ নিরাকারসাধনা দ্বারা মুমুক্ষুত্ব লাভ করা অতি কঠিন ; সেই জন্য সাধারণ জ্ঞানে মুমুক্ষুত্ব লাভের সহজ উপায় এবং সাধনার সুগম নিমিত্ত পাগলচূড়ামণি তন্ত্রে ঐ এক নিরাকার এবং নির্গুণ ব্রহ্মের বহুত্ব অর্থাৎ নানাপ্রকার রূপ, গুণ ও সর্ব্ব শক্তিবিশিষ্ট, এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষদাতা বলিয়া দেব দেবী উল্লেখপূর্ব্বক, এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ কল্পনা করিয়া, তাঁহাদেরই উপাসনা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কারণ সাধারণ জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অত্যন্ত বিষয়ানুরক্ত, তাহারা বিষয়লোভে অধিক বিষয়াপন্ন ব্যক্তিগণের শরণাগত হইয়া, তাহাদেরই উপাসনা করিতে থাকে। কিন্তু যখন তাহারা উপদেশ পাবে যে, ঐ দেবদেবী অতুল সম্পদ, গুণ এবং সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট সমস্ত ফলদাতা, তখন তাহারা ঐ মানুষের উপাসনা ত্যাগ করিয়া, দেব দেবীর শরণাগত

হোয়ে ধর্ম্মার্থকামের লালসায় তাহাদেরই উপাসনা করিতে ব্রতী হইবে, ঐরূপ উপাসনা করিতে করিতে একটু বিশেষ জ্ঞান হইলে, ঐ বিষয়েই তাহাদের মনের একাগ্রতা জন্মিবে; সুতরাং তাহারা যেরূপ প্রথমতঃ মানুষের উপাসনা ত্যাগ করিয়া, দেব দেবীর উপাসনায় অনুরক্ত হইয়াছিল, তেমনি ক্রমে ক্রমে যত তাহাদের ঐ বিশেষ জ্ঞান উন্নত হইবে, ততই ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের লালসা ঘুচিয়া, কেবল মোক্ষের প্রতি লালসা জন্মিবে, এবং সেই বিষয়ে মনের একাগ্রতা দৃঢ় হইলে, তাহাদের মুক্তিতে তীক্ষ্ণ ইচ্ছা হইবে, তখন তাহারা মুমুক্ষত্ব লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু ঐ মুমুক্ষুত্ব পরোক্ষ, অর্থাৎ সাক্ষাৎ নহে; ঐ রূপ সাধনার দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হয় না, বস্তুতঃ নিরাকার ও নির্গুণ সাধনা ভিন্ন অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইতে পারে না; এবং অপরোক্ষ জ্ঞান না হইলে নিশ্চয় আনন্দ হয় না।

অপরোক্ষ ও পরোক্ষ অর্থাৎ ব্যবধান ও অব্যবধান। পরের মুখে ঝাল খাওয়া পরোক্ষ (ব্যবধান) আর অপরোক্ষ, সাক্ষাৎ অর্থাৎ চক্ষু কর্ণের বিবাদ যেটা। (অব্যবধান)।

দেব দেবীর উপাসনার আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই তো পাগলের মনের কথা।

আর তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুই যে, ব্রত ও যজ্ঞাদির কথা বোলেছিস্; তা, ব্রতাদি কর্‌বার আসল উদ্দেশ্য কি?

দিশেঃ—লোকে নানা প্রকার কামনায় নানারূপ ব্রত করে, কিন্তু ব্রতাদি করার নিগূঢ় তাৎপর্য্য, আমি মুনি ঠাকুরদের কাছে শুনেচি; তাঁরা বলেন যে, ব্রত নিয়মাদি আর কিছুই নয়, ও গুলো কেবল মনের খাদ্ উড়োবার মশলা।

যেমত রূপোর খাদ্ সীসে। যখন রূপোতে খাদ্ হয়, তখন সেক্‌রা ঐ রূপোতে আরো খাদ্ অর্থাৎ সীসে দিয়ে ঐ রূপো গলাইলে, ঐ সীসের সঙ্গে আসল খাদ্ সীসে শুদ্ধ উড়ে গিয়ে রূপো খাটি হয়;

তেমনি বাসনা, স্পৃহা ও তৃষ্ণাদি মনের খাদ্; ঐ সকল বাসনাদি মনে অনবরত থাকে না, ক্ষণে ক্ষণে বৈরাগ্য উদয়ে তিরোহিত হয়; কিন্তু মনের ঐ খাদ্ উড়ুতে হোলে আরও বেশী বেশী বাসনা, স্পৃহাদি উহাতে মিশ্রিত করিতে হইবে এবং ঐ বাসনাদিকে অনিবরত মনে রাখ্‌বার জন্য কোন এক কামনা ব্রতে ব্রতী হইলে ঐ বাসনাদি মন হইতে মুহূর্ত্ত জন্যও তিরোহিত হয় না। পরে যখন্ ঐ ব্রত উদ্‌যাপন করা হয়, তখন ঐ ব্রতরূপ মিশ্রিত স্পৃহাদির সঙ্গে মনের আসল খাদ্ বাসনাদি উড়িয়া গিয়া, মন খাটি হয়।

যেমন চাণক্য পণ্ডিত বলেন যে,—

পাদবিদ্ধং করস্থেন কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।

যেমন পায়ে কাঁটা ভুঁকলে আর একটা কাঁটা প্রবেশ করাইয়া সেই ভোঁকা কাটাকে বাহির করিতে হয়, ইহাও তদ্রূপ।

আরও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি যে, কোন কোন দেশের ব্রাহ্মণ ঠাকুররা দ্বাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা সংক্রান্তি এবং যে দিন শ্রাদ্ধ করেন, সেই সকল দিনের সায়ং সন্ধ্যা করেন না ক্যানো?

দিশেঃ—এ সম্বন্ধে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত একটী স্মৃতিবচন আছে,—

দ্বাদশ্যাং পক্ষয়োরন্তে সংক্রান্ত্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ং সন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত—

সেই জন্য ঐ সকল দিনে সায়ং সন্ধ্যা করেন না।

নিশেঃ—ঐ বচন কি কোন যুক্তির মূলে হইয়াছে?

দিশেঃ—ভাই! আমি তো অনেক ভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগে ঐ বিষয়ের যুক্তি কি, জিজ্ঞাসা কোরেছিলাম। তাঁরা বলেন, আমরা ইহার কোন যুক্তি জানি না, কেবল বচনের উপর নির্ভর করিয়া সায়ং-সন্ধ্যা করি না।

নিশেঃ—যদি যুক্তি জানেন না, তবে ঐ বচনে যে সংক্রান্তির ও শ্রাদ্ধ করার দিন ও দ্বাদশ্যাদি তিথির উল্লেখ আছে, ঐ সকল দিনের ও তিথির অনুরোধে, কি দিনের ও তিথির কার্য্যানুরোধে ঐরূপ সায়ং সন্ধ্যা নিষেধ, তাহার সিদ্ধান্ত কিরূপে কোর্‌বেন? যুক্তিযুক্ত বিচার ভিন্ন তো ঐ বচনের সূক্ষ্ম অর্থ ও উদ্দেশ্য সিদ্ধান্ত কোর্‌তে পারা যায় না?

কিন্তু তাঁরা ঐ বচনের মোটামুটি অর্থ বুঝে ঐ দুই দিনে, এবং সায়ং কালে যে দিন ঐ সকল তিথি থাকে, সেই দিন সায়ংসন্ধ্যা করেন না। তা হোলে যদি দিনের ও তিথির কার্য্যানুরোধে সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ, ইহাই ঐ বচনের যুক্তিযুক্ত অর্থ ও উদ্দেশ্য হয়, তবে ঐ সকল দিনে সায়ংসন্ধ্যাকালে ঐ সকল তিথি থাকুক বা না থাকুক, ঐ ঐ দিনের ও তিথির কার্য্য যে দিনে করিবেন, সেই দিনেই সায়ং সন্ধ্যা নিষেধ, ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। অতএব ঐরূপ মোটামুটি বুঝে সায়ং কালে তিথি থাকলে সন্ধ্যা করেন না, আর না থাকলেই করেন, ইহাতে তো তাঁদের ধর্ম্মহানি হয়, যথা—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যবিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে ॥

মনুসংহিতা।

অন্য বচন।

যুক্তিযুক্ত মুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি।
অন্যৎ তৃণ মিব ত্যজ্য মপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা ॥

যো, বা।

আর, দিনের ও তিথির কার্য্যানুরোধে সায়ং সন্ধ্যা নিষেধ, ইহা যদি উক্তবচনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ঠাকুরদের সায়ংসন্ধ্যাসম্বন্ধে ঐরূপ আচরণে উভয়বিধ প্রত্যবায় হয়—প্রথমতঃ প্রায় সকলেই ঐ সকল দিনের ও তিথির কার্য্য, যাহা ব্রাহ্ম-

ণের নিত্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত আছে—ঐ নিত্য কার্য্য করেন না, এই এক প্রত্যবায; দ্বিতীয়তঃ কার্য্যানুরোধে সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ সত্বেও ঐ কার্য্য না করিয়াও আবার সন্ধ্যা করেন না, ইহাতেও প্রত্যবায় হয়। কারণ, বৈধ কার্য্য না করিলেও অপরাধ হয়, এবং অবৈধ কার্য্য করিলেও অপরাধ হইয়া থাকে।

দিশেঃ—ভাই! ঐ বিষয়ের বিচার কোরে সিদ্ধান্ত না কোর্‌লে তো হয় না। তা, ও বিষয়ের বিচার কোর্‌তে কারু মতি হয় না, ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ীরা তো কেবল ব্যবসায়ী, তাঁদের কেবল পয়সার চিন্তা; প্রকৃত ধর্ম্মে যদি তাঁদের মতি থাক্‌তো, তাহোলে ও বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি হোতো। সন্ধ্যা আহ্নিক আদি তাঁরা ততো বোঝেন না, তাঁরা কেবল পয়সা বোঝেন; তবে সন্ধ্যা আহ্নিক করা না দেখালে, লোকে ভক্তি কোরবে না বোলে যা-হয়-তাই করেন। তা নৈলে তাঁরা ও বিষয় যতক্ষণ ভাব্‌বেন, ততক্ষণ পয়সার ভাবনা ভাবলে তাঁদের ঢের কায হবে; তাঁরা অনর্থক ও সব ভাবনা ভাবেন না।

নিশেঃ—তবে তুই যত দূর পারিস্ ও বিষয়টার বিচার কোরে সিদ্ধান্ত কর্‌না ক্যানে? তাতেও যদি তাদের চোক্ ফোটে।

দিশেঃ—আমরা তো পাগল, তা আমাদের বিচার ও আমাদের কথা তো তাঁরা পাগল বোলেই উড়িয়ে দেবেন; আর চোক বুজে থাক্‌লেই তো ফোটে, কাণার চোক্ ফুট্‌বে কেন? বরং আঙ্গুল দিলে আরও বোসে যাবে।

তবে তুই বোল্লি, দেখি যত দূর পারি।

পাগলের বিচার।—

স্মার্ত্ত (রঘুনন্দন) মহাশয়, যখন নিত্য কার্য্যের ব্যবস্থা সংগ্রহ করণ সময়ে প্রথমতঃ

'সন্ধ্যামহরহ উপাসীত'

বলিয়া পরে দ্বাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি এবং শ্রাদ্ধ করার দিন সায়ংসন্ধ্যা নিষেধসম্বন্ধে বিশেষ বিধির বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন; যথা,—

দ্বাদশ্যাং পক্ষয়োরন্তে সংক্রান্ত্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ংসন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত—

তখন যে ঐ নিষেধের কারণ আছে, তাহাতে আর সন্দেহ হয় না; তবে যুক্তিযুক্ত বিচার ভিন্ন ঐ কারণের নির্ণয় হইতে পারে না।

এখন দেখিতে হবে যে, ঐ বচনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য কি? তিথি ও দিন জন্য, অথবা দিনের ও তিথির কার্য্য জন্য ঐরূপ সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ।

কোন শাস্ত্রের, কি বচনের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে; কেবল শব্দার্থ গ্রহণ করিলে হইবে না, ঐ শাস্ত্রের, কি বচনের আদ্যোপান্ত বিবেচনা করিয়া, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য নির্ণয়পূর্ব্বক তদনুসারে অর্থ করিতে হইবে; শাস্ত্রের বা বচনের অর্থ করিবার ইহাই প্রকৃত প্রণালী।

এখন দেখা যাক্ যে, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং দ্বাদশীতে তিথিজন্য আর সংক্রান্তি এবং শ্রাদ্ধের দিনে দিনজন্য, সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ, ইহাই উক্ত বচনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য কি না? তা হোলে দেখা যাচ্চে যে, ঐ সন্ধ্যা প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে, এই তিন কালে তিন বার করিতে হয়; এবং ঐ তিন সন্ধ্যা প্রায় একই প্রকার, তবে এই মাত্র প্রভেদ যে, প্রাতঃকালে গায়ত্রীর কুমারীরূপ, মধ্যাহ্নে যুবতী-রূপ ও সায়াহ্নে বৃদ্ধারূপ, ধ্যান করিতে হয়, এবং আঁচমনেও যৎসামান্য প্রভেদ আছে। কিন্তু ঐ তিন তিথিতে ও দুই দিনে প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিতে আছে, কেবল আহারের পর যে সায়ংসন্ধ্যা, তাহাই নিষেধ; অর্থাৎ ঐ সকল তিথির ও দিনের নিত্য কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বকালের সন্ধ্যা করিতে আছে, কিন্তু ঐ কার্য্য সমাধাতে আহারের পর যে সায়ংসন্ধ্যা, তাহাই করিতে নাই, ইহাতে যে তিথি ও দিন জন্য ঐরূপ সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ, তাহা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। যদি বল যে, ঐ সকল তিথির ও দিনের সায়ং কালে গায়ত্রীর বৃদ্ধা রূপ ধ্যানে, ঐ রূপের গুণে ফলের প্রতি-

বন্ধক হইবে, ও ইহাই যদি মনে উদয় হয় যে, তিনি স্বভাবশতঃ সায়ং কালে তাঁহার ধ্যান করিলে ঐ ধ্যান সিদ্ধি হবে না, তাহোলে যদি অন্যান্য দিনে ও তিথিতে তাঁহার ধ্যান সিদ্ধি হয়, তবে ঐ সকল দিন ও তিথিতে যে তাঁহার ধ্যানসিদ্ধি হইবে না, তাহারও কোন যুক্তি-যুক্ত কারণ দৃষ্ট হয় না। আর ঐ সকল দিন ও তিথি, এবং অন্যান্য দিন ও তিথি, ইহার মধ্যে ইহাই কেবল প্রভেদ যে, অন্যান্য দিনে ও তিথিতে ব্রাহ্মণের কোন নিত্য কার্য্য নাই, এবং ঐ সকল দিনে ও তিথিতে নিত্য কার্য্য আছে।

অতএব দিন ও তিথি জন্য যে, ঐরূপ সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ; উক্ত বচনের এরূপ অর্থ ও উদ্দেশ্য কোন মতেই ন্যায় ও যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে দেখা যাইতেছে যে, আমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে এবং সংক্রান্তি দিনে ব্রাহ্মণের নিত্য কার্য্য, যজ্ঞাদি, এবং একাদশীর উপবাসের পর দ্বাদশীতে পারণ ও শ্রাদ্ধ দিনে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, আর ঐসকল দিন ও তিথি উক্ত নিত্য কার্য্যের জন্যই প্রসিদ্ধ।

আরও দেখা যাচ্চে যে, শ্রাদ্ধ সকল দিনে ও সকল তিথিতেই হইতে পারে, সুতরাং "শ্রদ্ধবাসরে" শ্রাদ্ধ করার দিন যে, ঐ শ্রাদ্ধ-কার্য্যানুরোধে সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ, তাঁহাতে আর সংশয় হইতে পারে না।

সংক্রান্তি সম্বন্ধে। যদি 'শ্রাদ্ধবাসরে' কার্য্যানুরোধে সায়ংসন্ধ্যা-নিষেধ, সিদ্ধান্ত হইল, তাহোলে সংক্রান্তিও নিত্য কার্য্যের দিন, এবং ঐ সংক্রান্তির নিত্যকার্য্যের পূর্ব্বে প্রাতঃ এবং মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিবার বাধা নাই; তখন ঐ কার্য্য সমাধান্তে আহারের পর যে সায়ংসন্ধ্যা, তাহা ঐ কার্য্যানুরোধে নিষেধ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? যদি বল যে, সংক্রান্তিতে রবির সংক্রমণজন্য ঐ সায়ং-সন্ধ্যা নিষেধ, তাহোলে যখন ঐ সংক্রমণে প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় বাধা নাই, তখন সেই সংক্রমণজন্য সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ, ইহা কোন মতেই সম্ভব ও সঙ্গত নহে।

এখন তিথিসম্বন্ধে। ঐ তিন তিথি ভিন্ন, যদি আর কোন তিথিতে ব্রাহ্মণের ঐরূপ নিত্য কার্য্য থাকিতো, এবং সেই তিথিতে সায়ং-সন্ধ্যা নিষেধ না হইয়া, কেবল উক্ত তিথিত্রয়ে সায়ং সন্ধ্যা নিষেধের ব্যবস্থা হইত, তাহোলে ঐ তিন তিথিতে যে, তিথি জন্য সন্ধ্যা নিষেধ, তাহা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারিত, কিন্তু যখন ঐ তিথি ভিন্ন ব্রাহ্মণের নিত্য কার্য্যের অন্য তিথি নাই, এবং ঐ তিথিত্রয়ের নিত্য কার্য্যের পূর্ব্ব প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার বাধা নাই; তখন যে ঐ কার্য্য সমাধান্তে আহারের পর সায়ংসন্ধ্যা ঐ কার্য্যানুরোধে নিষেধ, তাহাই যুক্তিযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত হইতেছে; অতএব দ্বাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি ও শ্রাদ্ধ করার দিন, ঐ দুই দিনের এবং তিথি ত্রয়ের কার্য্যানুরোধে সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ, ইহাই উক্ত স্মার্ত্তবচনের প্রকৃত অর্থ ও শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইল।

অধিকন্তু যখন "শ্রাদ্ধবাসরে" বচনের এক অংশে কার্য্যানুরোধে সায়ং সন্ধ্যা নিষেধ, স্পষ্টরূপে প্রকাশ আছে, ও তাহাতে সংশয় নাই, তখন অন্য দিনেও যে ঐরূপ কার্য্যজন্য নিষেধ, তাহাই সম্ভব, তা না হোলে যে, বচনের এক অংশে এক কারণে ও অন্য অংশে আর এক কারণে সায়ং সন্ধ্যা নিষেধ, ইহা যদি শাস্ত্রকর্ত্তার উদ্দেশ্য হইত, তা হোলে তিনি ঐ বিষয় স্পষ্ট করিয়া উক্তি করিতেন।

আরো দেখ; সাধারণ বুদ্ধিতেও কি কখন উদয় হইতে পারে যে, সন্ধ্যা, যাহা ব্রাহ্মণের নিত্য কার্য্য, না করিলে প্রত্যবায় আছে, ঐ সন্ধ্যার কয়েক দিন অকারণ নিষেধের ব্যবস্থা হইল? তবে এক কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে অন্য এক কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করা যাইতে পারে, ইহা শাস্ত্রানুগত যুক্তি, এবং সেই যুক্তিমূলেই উক্ত বচনের উক্তি হইয়াছে, ইহাই বিবেচনা হয়।

যদি বল যে, দুই কর্ত্তব্য কার্য্যের মধ্যে যে কার্য্য গুরুতর, সেই কার্য্যের অনুরোধে অন্য কার্য্য ত্যাগ করিতে পারা যায়, তা হোলেও উক্ত সন্ধ্যা অপেক্ষা যজ্ঞাদি কার্য্য গুরুতর। কারণ, সন্ধ্যা কেবল ব্রহ্মোপাসনা এবং তৎসহ একটু যোগ আছে; কিন্তু যজ্ঞ বৃহৎ

কার্য্য, যাহাতে উক্তমত ব্রহ্মোপাসনা এবং বেদাদি পাঠ করিতে হয়, এবং তাহাতে এরূপ অনেক কার্য্য আছে, যাহা সম্পাদন করিলে, দেবগণ পরম সন্তুষ্ট হন।

আর একাদশীতে উপবাস করিয়া সমস্ত দিন হরিপূজা, অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনা, এবং রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক নাম কীর্ত্তন করিতে হয়। দ্বাদশীর পারণ ঐ কার্য্যের অন্ত; সুতরাং যজ্ঞ এবং পারণ সন্ধ্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কার্য্য বলা যাইতে পারে।

আর ঐরূপ নৈমিত্তিক কার্য্যসম্বন্ধেও যে ঐ বচনের বিধি প্রয়োগ হইবেনা, তাহারও কোন কারণ দেখা যায় না; স্মার্ত্ত মহাশয় নিত্যকার্য্য আন্দোলনকরণসময়ে ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, সেই জন্যই ঐরূপ নৈমিত্তিক কার্য্যের পর আহারান্তে সায়ংসন্ধ্যার কিরূপ বিধি হইবে, তাহা তৎকালে তাঁহার মনে উদয় হয় নাই, অথবা নৈমিত্তিক কার্য্য করিতে তো সকলে বাধ্য নন, সুতরাং সে সম্বন্ধে আর পৃথক্ বিধির প্রয়োজনাভাব বিবেচনা করিয়াছিলেন।

এখন ঐ সায়ংসন্ধ্যা নিষেধসম্বন্ধে যুক্তির অনুসন্ধান করায় এই একটি যুক্তি সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে, ঐ সকল দিনের ও তিথির কার্য্য সম্পন্ন করার পর আহার করিলে, শরীরের ভাবের বৈলক্ষণ্য ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রসকল শিথিল হইতে পারে, সেই হেতু সন্ধ্যাতে যে প্রাণায়ামাদি কুম্ভক যোগ আছে, তাহা সাধন করিতে হইলে, শারীরিক পীড়া হইবার সম্ভব, সেই জন্য ঐ কয়েক দিন আহারান্তে সায়ংসন্ধ্যা নিষেধের ব্যবস্থা হইয়াছে।

আরো শোনা যায় যে, এখনও পূর্ব্বদেশের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে, তাঁহারা যে দিন সামাজিক ভোজে গুরুতর ভোজন করেন, অথবা যিনি শ্রাদ্ধের পাত্রান্ন ভোজন করেন, সে দিন সায়ংসন্ধ্যা করেন না। ফল কথা, এখন প্রকৃত সন্ধ্যা তো প্রায় কেহই করেন না, কেবল আওড়ান বৈ নয়, নতুবা প্রকৃত সন্ধ্যা ও তৎসহ প্রাণায়ামাদি কুম্ভক যোগ ঐরূপ কার্য্যান্তে আহারের পর

কেহই সাধন করিতে পারিতেন না। শিবসংহিতায় এই বিষয়ের বেশ প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অতএব ব্রাহ্মণ ঠাকুরগণ যাঁহারা সন্ধ্যার অভিনয় করেন, তাঁহাদের অভিনয় ঠিক হয় না; এবং বর্ত্তমান সময়ে দ্বাদশী আদি তিথিতে ও সংক্রান্ত্যাদি দিনে সায়ংসন্ধ্যা সম্বন্ধে তাহারা যেরূপ আচরণ করেন, তাহাতে তাঁহাদের ধর্ম্মহানি হয়।

এইত পাগলের বিচার, এখন সহজ মানুষেরা এ সম্বন্ধে যিনি যাহা বলিতে ইচ্ছা করেন, বলুন।

দিশে ও নিশের মধ্যে যে ধাঁধা টুকু ছিল, তা মিটে গিয়ে দুজনে একজন হোলো, কেবল দুটী নাম মাত্র রহিল; এখন ঐ দুজনের কথা একজনের। অর্থাৎ দিশের কথাকে নিশের কথা ও নিশের কথাকে দিশের কথা জ্ঞান করিতে হইবে।

চতুর্থ কারখানা।

নিশেঃ—ভাই! বেলা তো তৃতীয় প্রহর হোয়েচে, আমাদের কি কিছু আহার করবার ব্যবস্থা আছে?

দিশেঃ—আমাদের পক্ষে প্রাণধারণের জন্য, একবার মাত্র সামান্য ভিক্ষা করিয়া,ভোজন করিবার ব্যবস্থা আছে। অধিক ভিক্ষা, কি অধিক আহার, করিবার নিয়ম নাই।

সে সম্বন্ধে মনুঠাকুর বলেন যে,—

এককালঞ্চরেদ্ভৈক্ষ্যং ন প্রসজ্জেত বিস্তরে।
ভৈক্ষ্যে প্রসক্তো হি যতির্ব্বিষয়েষ্বপি সজ্জতি॥

আর মনকে জয় করিতে হইলে, সন্ন্যাস অবলম্বন কোরতে হয়, এবং বিবাহ না কোরে নিঃসঙ্গ থাকিতে হয়, ও ভিক্ষা করিয়া পরিমিত আহার করিতে হয়।

এ সম্বন্ধে নারদ ঠাকুর যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন যে,—

যশ্চিত্তবিজয়ে যত্তঃ স্যান্নিঃসঙ্গোঽপরিগ্রহঃ।
একো বিবিক্তশরণো ভিক্ষুর্ভৈক্ষ্যমিতাশনঃ॥

আর ঐ ভিক্ষাদ্রব্য ভবিষ্যৎ কালের জন্য সঞ্চয় করিতে নিষেধ; হস্ত বা উদরমাত্রই পাত্র করিতে হইবে।

সায়ন্তনং শ্বস্তনং বা ন সংগৃহ্ণীত ভিক্ষিতম্।
পাণিপাত্রোদরামত্রো মক্ষিকেব ন সংগ্রহী॥

(ভাগবত ১১)

নিশেঃ—তুই যা বোল্লি, এসব তো যতি ও ব্রহ্মচারীর আচার। তা আমরা কি যতি?

দিশেঃ—হাঁ! আমরা তো যতি ব্রহ্মচারীই বোটি। পাগলে এবং যতি ব্রহ্মচারীতে প্রভেদ নাই, আমি ও সব কথা এর পর তোকে বেশ কোরে বুঝিয়ে দেবো; এখন ও সব কথায় কায নাই।

নিশেঃ—আচ্ছা! তবে আমাদের ভিক্ষা কার কাছে কোর‍্তে হবে?

দিশেঃ—গৃহিদিগের নিকটেই আমাদের ভিক্ষা করা কর্ত্তব্য, এবং তাঁরা আমাদিগে ভিক্ষা দিবেন ও আমাদের পরিচর্য্যা করিবেন বলিয়াই গার্হস্থ্য আশ্রমের এত গৌরব! গৃহস্থের নিকটে ভিক্ষু না থাকলে ঐ গৃহস্থ, গৃহস্থ বলিয়া প্রকাশ পান্ না।

ঐ সম্বন্ধে শুকদেব ঠাকুর বলিয়াছিলেন।—

মেরুসর্ষপয়োর্যদ্বৎ সূর্য্যখদ্যোতয়োরিব।
সরিৎসাগরয়োর্যদ্বৎ তথা ভিক্ষুগৃহস্থয়োঃ॥

আর গৃহস্থ ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে, তিনি বিষ্ণুর প্রতি ফল অর্পণ করিয়া যথোচিত কার্য্য করিবেন, এবং ভিক্ষুগণের যথাসাধ্য সেবা করিবেন।

ঐ সম্বন্ধে নারদ ঠাকুর যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন যে,—

গৃহেম্ববস্থিতো রাজন্ ক্রিয়াঃ কুর্ব্বন্ যথোচিতং।
বাসুদেবার্পণং সাক্ষাদুপাসীত মহামুনীন্॥

তা, ভাই! এখানে তো তুমি সেরূপ প্রকৃত গার্হস্থ্য আশ্রমী পাবে না। এখানে যে সব গৃহী আছেন, তাঁরা প্রকৃত আশ্রমী নন, তাঁরা ভ্রষ্টাশ্রমী; তাঁরা আদরপূর্ব্বক চেষ্টা ও তল্লাস করিয়া ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক, তাঁদের বাড়ীতে ভিক্ষুক গেলে, বরং বিরক্ত হন।

আর তাঁরাও যেমন ভ্রষ্টাশ্রমী, তেমনি ব্যবসায়ী ভিক্ষুকও তাঁদের কাছে যোটে; তাঁরাও দিতে চান্ না, ভিক্ষুকও ছাড়ে না।

তা নৈলে যতি ও ব্রহ্মচারী তো পকান্নস্বামী, গৃহিগণ অন্ন পাক কোরে আগে যতি ও ব্রহ্মচারীকে ভিক্ষা দিবেন, পরে আপনারা ভোজন করিবেন; এই তো গার্হস্থ্য আশ্রমীর ধর্ম্ম, তা না কোর্‌লে তাঁরা মহাপাপে লিপ্ত হবেন, এবং ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্তজন্য তাঁহাদিগের চান্দ্রায়ণ করিতে হইবে।

যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ পকান্নস্বামিনাবুভৌ।
তয়োরন্ন মদত্ত্বা তু ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥
(ভা ৩, ১১।৮)

আমি আগেই তো বোলেচি যে, এখানে প্রকৃত গৃহী নাই, সুতরাং অন্নের অগ্রভাগ ভিক্ষুককে দেওয়া যে, গৃহস্থের ধর্ম্ম, তাহা তাঁহারা জানেন না। এঁরা কেবল আপন আপন স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া আপনারা বিলক্ষণ আহার করেন এবং তাহাই তাঁহাদের গার্হস্থ্য আশ্রমের ধর্ম্ম বলিয়া জানেন। তবে শ্বশুর বাড়ীর লোক এলে আদর করিতে ত্রুটি করেন না, এবং আত্মবিস্তৃতি দেখাবার জন্য কখন কখন ঐরূপ গৃহস্থগণকে আহ্বান করিয়া ভোজন করান্, কিন্তু তার মধ্যে আবার বেশী ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিদের আদর বেশী। এই তো তাঁদের গার্হস্থ্য আশ্রমের ধর্ম্ম।

আরও পূর্ব্বে গার্হস্থ্য আশ্রমী ব্যক্তিগণের পত্নিগণ পতির অনুগামী এবং পতিব্রতা হইয়া কেবল পতির সন্তোষজনক কার্য্যে রত থাকিতেন। কিন্তু এখনকার প্রায় সকল গৃহিদের পত্নিগণের আর পাতিব্রত্য ধর্ম্ম নাই, তাঁহাদের পতিগণ তাঁহাদিগে উত্তম বসন ভূষণ দিতে, ও তাঁহাদের মনোমত কার্য্য করিতে, না পারিলে উঁহারা পতিকে সর্ব্বদা ভৎ'সনা করিয়া থাকেন এবং পতিগণ পত্নীর পতিব্রতা হওয়ার পরিবর্ত্তে আপনারাই পত্নিব্রত হইয়া স্ত্রীর মনযোগানো গার্হস্থ্য আশ্রমের সার ধর্ম্ম জ্ঞানে সেই ধর্ম্ম পালন করেন।

তবে শুনেচি যে, স্থানে স্থানে প্রকৃত গার্হস্থ্য আশ্রমী আছেন, তাও অতি অল্প; এবং তাঁরাই যে, সকলে প্রকৃত ধর্ম্ম পালন করেন, তা নয়; তবে গার্হস্থ্য আশ্রমের অনেকটা অভিনয় করিয়া থাকেন, তাও ধর্ম্ম ভেবে নয়, অধিকাংশই কেবল আত্মবিভূতি দেখাবার জন্য।

যাই হোক্, সে জন্য বেশী চেষ্টা কোর্‌তে গেলে, আমাদের আসল কাযের ঢিল পোড়বে, সুতরাং এখনকার গৃহিগণের নিকট ভিক্ষা দ্বারা আমাদের জীবন ধারণের উপায় নাই; এখন নিকটস্থ তরুগণের নিকট ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করাই আমাদের শ্রেয়ঃ।

নিশেঃ—ভাই! তবে তুই বোস্, আমি কিছু ফল মূল আহরণ করিয়া আনি, এই বলিয়া, নিশু অল্পক্ষণমধ্যেই নিকটস্থ তরুগণের নিকট ভিক্ষা করিয়া কিছু ফল আনিল, এবং উভয়ে প্রাণধারণোপযোগী ভোজন করিয়া, নিশে বলিল যে, আমাদের সঙ্গেতো কোন পাত্র নাই যে, ঐ নদী থেকে জল আনবো; তা, ভাই! জিজ্ঞাসা করি যে, আমাদের কি কোন পাত্র রাখ্‌তে নাই?

দিশেঃ—আমাদের অন্য কোন ধাতু পাত্র রাখ্‌তে নাই, তবে মৃত্তিকাপাত্র ও অলাবুপাত্র রাখ্‌বার ব্যবস্থা আছে।

অলাবুং দারুপাত্রঞ্চ মৃণ্ময়ং বৈদলন্তথা।
এতানি যতিপাত্রাণি মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ॥

স্মৃতি আ, তত্ত্বের উদ্ধৃত যমবচন।

আরো মনুঠাকুর বলেন যে,—

কপালং বৃক্ষমূলানি কুচেলম্ সহায়তা।
সমতাশ্চৈব সর্ব্বস্মিন্নেতন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥

তা, আমাদের, ভাই! অন্য পাত্র রাখবারই বা প্রয়োজন কি? আমাদের যে হাত পাত্র আছে, তাহাই যথেষ্ট। চল, আমরা ঐ নদীতে গিয়ে জল খেয়ে আসি। এই কথায় দুজনে নদীতে গিয়ে আপন আপন করপাত্র দ্বারা জল পান কোরে এসে, পুনরায় আপ-নার আপনার আসনে বসিলেন। এদিকে ক্রমে ক্রমে দিবা অবসান হইয়া সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন।

দিশেঃ—সেদিন শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা উদ্ধব ঠাকুরকে বোলেছিলেন যে, জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তির স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তির সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য যে,—

স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ ॥
ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাৎ যথা পুংসো যথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥
ভা। ১১।১৪।২৯।৩০

তা হলে ত, ভাই! গার্হস্থ্য আশ্রমীরা স্ত্রীসঙ্গী, তা তাদের কাছে আমাদের ভিক্ষা করা কিরূপে সঙ্গত হো'তে পারে?

দিশেঃ—শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা যে স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ ত্যাগ কোরতে বোলেছেন, তার তাৎপর্য্য এই যে, এই জগতে "বিষয়" একটি অত্যন্ত সংক্রা-মক জিনিষ; মানুষকে আক্রমণ ও মোহিত করা তাহার স্বভাব এবং ধর্ম্ম; স্ত্রী ঐ বিষয়ের মধ্যে একটী প্রধান জিনিষ; সেই জন্য, স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তিগণ অতিশয় বিষয়ানুরক্ত বলিয়া, তাদের সঙ্গদোষে জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তির, ঐ সংক্রামক বিষয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, পাছে তাহাতে

অনুরাগ জন্মায়, এই আশঙ্কায় শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ ত্যাগ কোরতে বলেন; তা নৈলে আপনার মন খাঁটি রাখ্‌তে পার্‌লে, কোন সঙ্গতেই কিছু কোর্‌তে পারে না। আর স্ত্রীসঙ্গী প্রভৃতি পাঁচ ভূতের মাঝখানে থেকে একলা থাকাইত প্রশংসার কায্। সে কথা সে দিন কপিল দেবও বলেছিলেন।

——দ্বন্দ্বারামেষু য একো রমতে বুধঃ।
পরেষামনুপধ্যায়ং স্তুং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

ম, ভা,

যেমন সাপের ঔষধ ইসের মূল, তেমনি ঐ সব সংক্রামক জিনিসের ঔষধ বৈরাগ্যের মাদুলি; ঐ মাদুলি একবার ধারণ কোর্‌তে পার্‌লে, সব ভূতের মাঝখানে থাক্‌লেও আর কোন ভূতেই ছুঁতে পারে না, আবার একলা থেকে মনে বিষয়-অনুরাগ থাক্‌লেই পাঁচ ভূতে জ্বালাতন করে।

ঐ সম্বন্ধে সে দিন আটবাঁকা ঠাকুর বোলেছিলেন যে,—

ন ধাবতি জনাকীর্ণং নারণ্যমুপশান্তধীঃ।
যথা তথা যত্র তত্র সময়ে বাবতিষ্ঠতি॥

যাঁহার বুদ্ধি শান্তি অবলম্বন করিয়াছে, তিনি জনাকীর্ণ নগরে বা গ্রামে ধাবমান হন না, এবং অরণ্যেও প্রবেশ করেন না। তিনি যেকোন সময়ে যেকোন স্থানে যেকোন রূপে অবস্থান করেন, তাহাতেই পরিতুষ্ট থাকেন।

আর তুই বোল্লি যে, গার্হস্থ্য আশ্রমীরা স্ত্রীসঙ্গী; তা তাঁরা প্রকৃত স্ত্রীসঙ্গী নন্, কেননা স্ত্রীতে তাঁদের আসক্তি নাই, স্ত্রীও তাঁদের তেম্নি। যতি ব্রহ্মচারীরও যে ধর্ম্ম ও যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম, প্রকৃত গৃহস্থেরও সেই ধর্ম্ম ও সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তবে এই মাত্র প্রভেদ যে,

গৃহীকে কেবল ঋতুকালে ভার্য্যা গমন করিতে হয়, অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে তাঁদের ব্রহ্মচর্য্য বৃত্তির বিচ্ছেদ হয়; যথা,—

এতৎ সর্ব্বং গৃহস্থস্য সামাম্নাতং যতেরপি।
গুরুবৃত্তির্বিকল্পেন গৃহস্থস্যর্তুগামিনঃ॥
ভা, ৭।১২।১১।

তা হো'লে প্রকৃত গার্হস্থ্য আশ্রমিগণ স্ত্রীসঙ্গী নন, স্ত্রী কেবল তাঁদের পরিচারিকা এবং দ্বৈতবাদধর্ম্মমতে ঐ স্ত্রীপুরুষে কেবল সেব্য-সেবক সম্বন্ধ মাত্র।

এমতে ঐ গৃহিগণের নিকট আমাদের ভিক্ষা সম্পূর্ণ বিধেয়, এবং আমাদিগকে ভিক্ষা দিবার জন্য তাঁহারাই যোগ্য পাত্র ও আমাদিগে ভিক্ষা দেওয়া তাঁহাদেরই প্রকৃত ধর্ম্ম।

এখন তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুই সেই প্রথম দিন, বলেছিলি যে, এখন অশৌচ হলো, তা, ভাই, অশৌচ কি?

নিশেঃ—মন অথবা শরীর মলবিশিষ্ট হইলেই তাহাকে অশৌচ বলে। ঐ অশৌচ দুই প্রকার,—বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক। তাবাহ্যিক অশৌচ শরীরের অশুচি এবং আভ্যন্তরিক অশৌচ মনের অশুচি। বাহ্যিক অশৌচ কেবল নাম মাত্র, মনের অশৌচই অশৌচ; তবে বাহ্যিক অশৌচ আভ্যন্তরিক অশৌচের একটী কারণ বলিয়াই তাহাকে অশৌচ বোল্‌তে হয়। যে পদার্থ শরীরে লাগলে কি শরীরকে আবৃত কোর্‌লে, শরীরে তাপ হইয়া মনপর্য্যন্ত সন্তপ্ত হইতে পারে, সেই পদার্থ শরীরে লাগ্‌লেই কি শরীরকে আবৃত কোল্লেই, বাহ্যিক অশৌচ হয়; এবং এরূপ কোন পদার্থ আছে, যাহার গুণ ঐরূপ নয়, কিন্তু মনের সংস্কার বশতঃ ঐ পদার্থ স্পর্শ কোর্‌লে, মন সন্তপ্ত হয়, তাকেও বাহ্যিক অশৌচ বলে। আর শরীর ক্ষতাদি হওয়ার জন্য মন সন্তপ্ত হইলেও বাহ্যিক অশৌচ বলা যায়। ফলে মন সন্তপ্ত ও চঞ্চল হওয়াই অশৌচ। আর যখন মনে বাসনা ও স্পৃহাদি প্রবল বেগে উদ্ভূত হয়, তখন মন তাদের কাযেই ব্যস্ত ও

অস্থির হইয়া উঠে, মনের ঐ চঞ্চলতাকেই আভ্যন্তরিক অশৌচ বলে। ঐ বাসনাদি হইতে হর্ষ ও বিষাদ উদ্ভব হয়, এবং উভয়েই মনকে চঞ্চল করে; কারণ, আশা পূর্ণতা লাভ করিলে হর্ষ ও হত হইলে বিষাদ উপস্থিত হয়, সুতরাং ঐ উভয় কারণেই অশৌচ হইতে পারে, তন্নিমিত্ত ঐ হর্ষজন্য অশৌচকে জাতাশৌচ ও বিষাদজন্য অশৌচকে মৃতাশৌচ বলিয়া স্মৃতিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

দিশেঃ—যদি অশৌচ ঐ রকমে ও ঐ কারণে হয়, তবে অশৌচান্ত সম্বন্ধে ব্রাহ্মণের দশ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ, বৈশ্যের পঞ্চদশ ও শূদ্রের ত্রিশ দিন, এরূপ ইতর বিশেষ ব্যবস্থা হোয়েছে কেন ?

নিশেঃ—ব্রাহ্মণ সত্বগুণাধিক, সুতরাং তাঁদের জ্ঞানের প্রাখর্য্য বেশী, সেই জন্য ঐ হর্ষ বা বিষাদ নিমিত্ত তাঁহাদের মনের চঞ্চলতা ঊর্দ্ধ সংখ্যা দশ দিনের অধিক স্থায়ী হইবার সম্ভব নয়; এই যুক্তিতে তাঁহাদের অশৌচান্তের নিয়ম ঐ দশ দিন; এবং ক্ষত্রিয় সত্ব ও রজো গুণে উৎপন্ন, তন্মধ্যে রজোগুণাধিক্য, সুতরাং তাঁদের জ্ঞান ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কম, সেই জন্য ঐ মূলে তাঁদের অশৌচান্তের নিয়ম দ্বাদশ দিন; আর বৈশ্য রজো ও তমোগুণে উৎপন্ন, তন্মধ্যে তমোগুণাধিক্য এবং তাঁদের জ্ঞান ক্ষত্রিয় অপেক্ষা কম, সুতরাং উপরোক্ত মূলে তাঁদের অশৌচান্তের নিয়ম পঞ্চদশ দিন এবং শূদ্র কেবল তমোগুণোৎপন্ন, তাদের জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন, সেই জন্য ঐ মূলে তাদের অশৌচান্তের নিয়ম এক মাস ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সেইরূপ নিকট জ্ঞাতি ও সম্বন্ধ এবং দূর জ্ঞাতি ও সম্বন্ধ হেতু ঐরূপ হর্ষ বিষাদ জন্য মনের চঞ্চলতা বেশী অথবা কম দিন স্থায়ী সম্ভব বিবেচনায় সেই সম্বন্ধে অশৌচান্তের দিনের ও সময়ের তারতম্য হইয়াছে।

দিশেঃ—ঐ অশৌচকালে ব্রাহ্মণাদি সকলকেই নিত্যকার্য্য কোর্‌তে নিষেধ কেন ?

নিশেঃ—মনের চঞ্চলতা থাকলে উপাসনাদি কোন কার্য্যই হয় না, কারণ উপাসনাদি কেবল এক বিষয়ে মনকে স্থির রাখবার

কার্য্য, এমতে প্রথমতঃ মনকে একটু স্থির কোর্‌তে না পার্‌লে কোন এক বিষয়ে কোন ক্রমেই তাহাকে লইয়া যাইতে এবং স্থির রাখ্‌তে পারা যায় না, কিন্তু উপরোক্ত মত হর্ষবিষাদজন্য মন এত অধিক চঞ্চল হয় যে, ঐ নিয়মের অধীন ভিন্ন অন্য কোন গতিকেই মন সাধারণ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে না।

দিশেঃ—ঐ নিয়মের পরেই মনের স্বাভাবিক অবস্থা হয় কেন?

নিশেঃ—ঐ হর্ষ-বিষাদ জন্য মনের চঞ্চলতা কতক জ্ঞানের দ্বারা ও কতক দিন গতে স্বভাব গুণে নিবারণ হয়। অতএব মনের ঐরূপ চঞ্চলাবস্থায় উপাসনাদি হোতেই পারে না এবং কোর্‌লেও কোন ফল হয় না, সেই নিমিত্তই অশৌচকালে নিত্য কার্য্য নিষেধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আর মনের চঞ্চলতা নিবারণ অর্থাৎ মন স্থির করাকেই শুচি হওয়া বলে।

দিশেঃ—স্বাভাবিক অবস্থাতেও স্বভাব গুণে মন চঞ্চল থাকে, তবে উপাসনা কর্‌বার পূর্ব্বে তাকে স্থির কর্‌বার, অর্থাৎ শুচি হবার, কোন উপায় আছে না কি?

নিশেঃ—আছে বৈ কি, পূর্ব্বেই তো বোলেচি যে, বাহিক অশৌচের সহিত আভ্যন্তরিক অশৌচের সংযোগ আছে,—

১। প্রাতে স্বভাবের নিয়মমত উদরের মল নির্গত করিতে হইবে, তাহাকে লোকে শৌচ বলিয়া ব্যবহার করেন। এই খানে আর একটা কথা বোল্‌তে হোচ্চে, সাত্বিক আহারের যে ব্যবস্থা আছে, ঐ আহারীয় দ্রব্যসকল এরূপ গুণবিশিষ্ট, যাহার অধিকাংশই সারভাগ। ঐ সকল দ্রব্য আহার করিলে ঐ সার ভাগে রক্ত হয়, এবং ঐ রক্তে সত্ত্ব গুণের ভাগই বেশী, আর অসার ভাগে যে মল হয়, তাহাও প্রায় নীরস; সুতরাং সাত্বিক আহারের গুণে মানুষের শরীর ও মন সন্তপ্ত হইতে পায় না, অতএব প্রথমতঃ সাত্বিক আহার করাই উচিত।

২। তৎপরে দন্তধাবন দ্বারা মুখের মল নির্ম্মল করিয়া, অনেক বার কুল্লি করণ দ্বারা মুখের উষ্ণতা নিবারণ করিতে হইবে।

৩। তার পর অবগাহন পূর্ব্বক শীতল ও নির্ম্মল জলে স্নান ও

শরীরের সকল স্থান উত্তমরূপে মার্জ্জন ও ধৌত করিয়া সমস্ত মল নির্ম্মূল করিতে হইবে।

তা হোলেই যদি শরীরের মলের উষ্ণতায়, অর্থাৎ বাহ্যিক অশৌচে মন সন্তপ্ত হইয়া আভ্যন্তরিক অশৌচ হইয়া থাকে, তবে ঐ অশৌচের অন্ত হইবে, অর্থাৎ মন অনেক পরিমাণে শীতল হইয়া স্থির হইবে।

৪। তদনন্তর নির্জন স্থানে কুশাসনে উপবেশন, এবং সম্মুখে নির্ম্মল ও শীতলজলপূর্ণ কুশী সহ কোশা (তাম্র পাত্র) স্থাপন; ঐরূপ স্থানের ও আসনের গুণে এবং তাম্রপাত্রস্থিত শীতল জলের স্পর্শ-গুণেও মন স্থির হইবার বিশেষ সম্ভব।

৫। আর ললাটের ঊর্দ্ধভাগেই মনের স্থান, অতএব মনকে শীতল রাখ্‌বার জন্য ললাটে গঙ্গামৃত্তিকা অথবা চন্দনাদি লেপন পূর্ব্বক ফোঁটা করিতে হইবে। কারণ, শীতল থাকলেই মন সুস্থির হইয়া আপন স্থানে থাকে, নতুবা উষ্ণ হইলে অস্থির হইয়া হৃদয়ে নামিয়া পড়ে; হৃদয়ই তার কার্য্যের স্থান, সুতরাং সে তথায় বাসনা-দির কার্য্যে ব্যস্ত ও অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠে।

উপরোক্ত মত মন হৃদয়ে নামিতে না পারে এবং নামিলেও বেশী অস্থির না হয়, সেই জন্যই ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত দ্বারা সর্ব্বদা হৃদয় আচ্ছাদিত থাকে ও ঐ যজ্ঞোপবীতের সংযোগে উত্তরীয় বস্ত্র দ্বারা হৃদয় আচ্ছাদন করিতে হয়।

হৃদয়াচ্ছাদনে যে, মনের চঞ্চলতা নিবারণ হয়, তাহার এই একটি দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে, দুঃখ কি শোকাদি জন্য কোন ব্যক্তির মন চঞ্চল হইলে, যদি তৎকালে তাহার বুক (হৃদয়) চাপিয়া ধরা যায়, অথবা বালিসে বুক চাপিয়া রাখিলে, তাহার ঐ শোক, অর্থাৎ মনের চঞ্চলতা, অধিক পরিমাণেই লাঘব হইয়া থাকে।

আরও দেখা যায় যে, নব জাত শিশুকে যখন শয়ন করান হয়, তখন তাহার বুক (হৃদয়) উপযুক্ত বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করা হয়, কারণ ঐরূপ আচ্ছাদন দিলেই শিশু সুস্থির থাকে, নতুবা চঞ্চল হইয়া এক স্থানে স্থির থাকে না।

৬। তার পর সুগন্ধি পুষ্প, চন্দন, ধূপ, ধুনাদি সুগন্ধ দ্রব্যের আহরণ। উক্ত সুগন্ধাদি আঘ্রাণে মনকে স্বস্থানে রাখে ও আকর্ষণ করে; এবং মন স্বস্থানাগত হইলে ও থাকিলেই স্থির থাকে।

ঐ সমস্ত কার্য্যেই স্বাভাবিক মনের অশৌচান্ত কর্‌বার নিয়ম বলিয়া পাগলের মনে উদয় হয়।

৭। এখন উপাসনা।

মনের একাগ্রতা সাধনা ও অভ্যাস করাই উপাসনা। অতএব কোন্ বিষয়ে মনের একাগ্রতা সাধনা ও অভ্যাস করিতে হইবে, প্রথমতঃ তাহার নির্ণয় করাই "আচমন"; যথা,—

"ওঁ বিষ্ণুঃ।
তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষু রাততম্॥

আকাশে বিস্তৃত-চক্ষুর (তেজঃপুঞ্জের) ন্যায় বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ পদ পণ্ডিতগণ অবিচ্ছেদে দৃষ্টি করেন।

অতএব আমি ঐ পরম পদে মনের একাগ্রতা করিব, ইহাই স্থির করিয়া তাহারই সাধনা ও অভ্যাস করিতে রত হইলাম; মনের এই সঙ্কল্পই "আচমন"।

আর ঐরূপ মনের একাগ্রতা সাধন ও অভ্যাসই যখন উপাসনা হইতেছে, তখন পাগলের মনে ইহাই উদয় হয় যে, ক্রমে ঐ উপাসনা সিদ্ধি করিতে পারিলেই মুক্তিপথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে।

দিশেঃ—ব্রাহ্মণ ঠাকুররা শূদ্রদিগে কোন কায আরম্ভ করাবার পূর্ব্বে তাহাদিগে শুচি করিবার জন্য যে, একটা মন্ত্র পড়ান্, যথা,—

অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ॥

এতে কি শুচি হয়?

নিশেঃ—হবে না কেন? যদি পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ কোর্‌তে পারা যায়, তা হোলেই শুচি হয়। কিন্তু স্মরণ করা তো কেবল মুখের কথায় হয় না, তুই তো এক জন পাগল, তা তুই ঠিক কোরে মনে ভেবে মন লাগিয়ে দেখ্ দেখি, অন্য সব বিস্মরণ না হোলে আর পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ কোর্‌তে ও মনে ঠিক রাখ্‌তে পারা যায় না। কিন্তু আমি উপরে যে সব আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কথা বোল্লাম, প্রথমতঃ ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা মনকে একটু স্থির কোর্‌তে পার্‌লে, তবে অবিচ্ছেদে ঐরূপ স্মরণ কোর্‌তে ও তাহা ঠিক্ রাখ্‌তে পারা যায়, মাঝে মাঝে ভাঙ্গে না। আর ঐরূপ স্মরণ কোর্‌তে ও রাখ্‌তে পারলেই তো মনের একাগ্রতা হইয়া মন শুচি হয়, এবং তা হোলে তো আর কোন কায্ কোর্‌তে হয় না। এই আমার পাগলামীর কথা।

দিশেঃ—তুই যা বোল্লি, ওসব তো সোজা কথা নয়, ওসব বড় সক্ত কথা, তা ঐসব কথা তোকে কেউ বোলে দিয়েছিল নাকি?

নিশেঃ—বোলে আর কে দেবে, আমার জ্ঞানগুরু বোলে দিলেন, আর আমি বোল্লাম।

এখন আমি একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করি যে, সকল মুনি ঠাকুররাই তো বোলেচেন যে, আত্মতত্ত্বজ্ঞানলাভ করাই মানুষের শ্রেয়ঃ এবং মুক্তিলাভের শেষ সোপান; ও নিঃসঙ্গ হোয়ে যোগ সাধনা ও অভ্যাসাদির দ্বারা ঐ জ্ঞান লাভ হয়; তবে লোক ঈশ্বর-চিন্তা ও ধর্ম্মালোচনা কর্‌বার জন্য নানাপ্রকার সম্প্রদায় হইয়া ধর্ম্ম প্রচার কোরে বেড়ান ক্যান!

দিশেঃ—প্রবৃত্তিদলে সাধারণতঃ প্রায় সকল লোকই অত্যন্ত বিষয়ানুরাগী। ঈশ্বরচিন্তা ও ধর্ম্মালোচনায় একেবারেই তাঁদের মতি লোপ হইয়াছে; তাঁদের কেবল বিষয়ালোচনা ও বিষয়চিন্তাতেই মতি প্রবল; সেই জন্য অধিকাংশ লোকেরই সর্ব্বদা অর্থচিন্তা ভিন্ন অন্য চিন্তা নাই। এমন কি, তাঁহারা ধর্ম্মালোচনা ও ঈশ্বর চিন্তার ভাণ কোরেও ধন উপার্জ্জন করিতে ত্রুটি করেন না; সুতরাং ঐ

ধনলোলুপ ব্যক্তিগণের মধ্যে কি পণ্ডিত, কি বিষয়ী, সকল শ্রেণীর লোকই কিরূপে অর্থ উপার্জ্জন কোরে স্ত্রীর অলঙ্কার হবে, কিসে লোকে বড় বোল্‌বে, লোকের কাছে মান সম্ভ্রম হবে ও আপনারা ভাল খাবেন, ভাল পোর্‌বেন এবং দোতলা কোটা আদি বড় মানষী সরঞ্জম হবে, এই ভাবনাতেই তাঁরা সর্ব্বদা এত ব্যস্ত যে, প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বর-চিন্তা কি ধর্ম্মালোচনার বিষয় একবারও তাঁদের মনে উদয় হয় না।

আবার ঐ ধন উপার্জ্জন করবার জন্য তাঁদের রকম রকম সম্প্রদায় আছে, তার মধ্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণঠাকুরদের ধর্ম্মযাজক বোলে যজমান করা ও ধর্ম্মোপদেশ দেবেন বোলে শিষ্য করা ব্যবসায়; কিন্তু ঐরূপ শিষ্যযজমান কোর্‌তে হোলে যে, ঐ যজমান শিষ্যের কত-দূর মন যোগাতে হয়, তা যাঁরা করেন, তাঁরাই টের পান, তাতে তাঁদের দৃক্‌পাতও হয় না, নজর কেবল পয়সার দিকে। ঐ সম্প্রদায়ীদের উক্ত ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহাদি সকল কার্য্যই হইয়া থাকে, এবং তাঁরা ধর্ম্মালোচনা ও ঈশ্বর উপাসনাদির যে সকল কার্য্য দেখান্, সে কেবল তাঁদের ঐ ব্যবসায়ের কার্য্য মাত্র; কারণ যজমান শিষ্যকে ঐরূপ কায্ না দেখালে তাদের ভক্তি হবে না ও তা না হোলে পয়সা দেবে না, এই ভয়েই ঐরূপ কার্য্য করেন। আবার বাড়ীতে থাকুলে ঐ কায্ যত হোক্ আর না হোক্, শিষ্যযজমানের বাড়ী গেলেই আড়ম্বরের সীমা থাকে না। ফলকথা, তাঁদের সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র কেবল পয়সার চিন্তা ও পরিবারের চিন্তা, আপনার ভাবনা একবারও ভাবেন না ও ভাব্‌বার সময়ও পান না।

আবার ধর্ম্ম-শাস্ত্রব্যবসায়ী বোলে আরও এক সম্প্রদায় আছে, অর্থ উপার্জ্জন সম্বন্ধে তাদেরও ঐরূপ আচরণ।

ঐ দুই সম্প্রদায়ী ঠাকুররা যাই করুন আর তাই করুন, তাঁরাতো পদে আছেন। কিন্তু বিষয়ের এমনি টান্ যে, তাঁদের মধ্যে অনেকে ঐ বৃত্তিতে পয়সা কম বোলে ঐ বৃত্তি ত্যাগ ও দাস্য বৃত্তি অবলম্বন কোরে এক সম্প্রদায় হইয়াছেন। ফলে তাঁরা বাগে পেলে সময়ে সময়ে পূর্ব্ববৃত্তির দ্বারা পয়সা রোজ্‌গার কোর্‌তেও ছাড়েন না।

উক্ত সম্প্রদায়ীর লোকেরা দাসত্ববৃত্তির দ্বারা প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেন বোলে তাঁদেরই মান বেশী এবং তাঁরাই বড়লোক বোলে খ্যাত হন, সেই জন্য দাসত্বপদে নিযুক্ত হবার জন্য প্রায় সকলেই লালায়িত। অধিক কি, দাসত্বপদে নিযুক্ত হোতে পাব্‌লেই অমনি সকলে বলেন যে, এখন ও ব্যক্তির সময় ভালো।

এখন ধর্ম্মচর্চ্চার পরিবর্ত্তে যে ব্যক্তি বেশী অর্থ উপার্জ্জন করেন, প্রায় সকলে তাঁর বিষয়েরই চর্চ্চা করিয়া থাকেন; মূল কথা, পয়সার কথাও ভাল লাগে।

পয়সার জন্য যে কোন জাতির বা ব্যবসায়ীর বৃত্তি অবলম্বন করিতে কাহারও দিখিদিক জ্ঞান থাকে না।

যাই হোক্‌, কালধর্ম্মে ও প্রকৃতিগুণে সকলই হোতে পারে। মুনি ঠাকুররা যে বিষয়কে বিষের ন্যায় ত্যাগ কোর্‌তে বোলেচেন, ঐ সব লোকদের পক্ষে সেই বিষয় এখন প্রভুপরমেশ্বর হোয়ে দাঁড়িয়েচে এবং বিষয়ের সহিত তাঁহাদের সেব্যসেবক সম্বন্ধ হইয়া তাঁদের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মালোচনা ও ঈশ্বর চিন্তা করা প্রায় একেবারে উঠিয়া গিয়াছে।

তবে প্রকৃতিবিকারে কারু কারু বিশেষ জ্ঞানের উদয় হইলে ধর্ম্মালোচনা ও ঈশ্বর চিন্তা করিবার জন্য তাঁদের মতি প্রবল হইয়া উঠে এবং সময়ে সময়ে তাঁহারা ঐ আলোচনা ও চিন্তা করেন, কিন্তু তৎকালে তাঁদের জ্ঞানতো একেবারে উন্নত হয় না, সুতরাং আরও বেশী সঙ্গী কর্‌বার ইচ্ছা এবং আপনার স্বার্থ ত্যাগ করিয়া পরের মঙ্গল জন্য জীবন উৎসর্গ করিব বলিয়া একটী অভিমানের উদয় হয়; সেই নিমিত্ত সকলকে ধর্ম্মালোচনায় রত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা সম্প্রদায় হইয়া সকলের কাছে ধর্ম্ম প্রচার ও তৎসম্বন্ধে নানারূপ উপদেশ দিতে থাকেন।

আর সহজেইতো সকলের ধর্ম্মালোচনায় মতি হয় না, সেই জন্য ধর্ম্মপথে সকলেরই মন আকর্ষণ করিবার জন্য তাঁহারা গীত, বাদ্য, কীর্ত্তন ও নগরকীর্ত্তনচ্ছলে ধর্ম্মালোচনা করেন। ফলে সকলের

জ্ঞান, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি তো সমান নয়, সেই কারণে সাকার ও নিরাকার উপাসনাভেদে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় হন্। ফলে ঐ সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ী মহাত্মাগণের উদ্দেশ্য একই, তবে উপাসনাদির কার্য্য প্রণালী ও আচার-ব্যবহারের কিছু প্রভেদ আছে।

কিন্তু ঐরূপ সম্প্রদায় ও সঙ্গী করা অযৌক্তিক নহে, কেননা আগে না সঙ্গ কোর্‌লে সহজে নিঃসঙ্গ হোতে পারা যায়না, ক্রমে ধর্ম্মালোচনা ও ঈশ্বর চিন্তা করিতে করিতে জ্ঞান একটু বিশুদ্ধ হইলেই আর সম্প্রদায়ে থাকতে ইচ্ছা হয় না, তখন সম্প্রদায় ত্যাগ কোরে নিঃসঙ্গ হোয়ে নির্জ্জনে সাধনা ও উপাসনাদি করিবার মতি হয়।

মহাত্মা ইন্দ্রদেব ঠাকুর তাহার একটী আশু দৃষ্টান্ত।

এখন বোল্‌তে হোচ্চে যে, প্রবৃত্তিসমাজের সাধারণ লোকদের মধ্যে ধর্ম্মালোচনা ও ঈশ্বরচিন্তা নাই বোলে এরূপ পৃথক পৃথক সম্প্রদায় হইতেছে, ইহাতে ঐ সাধারণ লোকদের দোষ ভিন্ন ঐরূপ সম্প্রদায়ের দোষ বলা যাইতে পারে না; বরং ঐরূপ সম্প্রদায় হওয়ার এক প্রকার সুবিধা বোল্লেও বলা যায়; কারণ যদি পূর্ব্বোক্তমত কাহাক ধর্ম্মালোচনা কর্‌বার মতি হয়, তবে তাঁকে আর সঙ্গী খুঁজ্‌তে হয় না, কোন এক সম্প্রদায়ে মিশে পোড়্‌লেই হয়।

নিশেঃ—আচ্ছা, সাধারণে সমাজেরই দোষ বটে, আর তিনি ঐ সম্প্রদায়ে মিশুন্, কিন্তু তিনি যদি নিরাকার উপাসকদলে কি বৈষ্ণবদলে মেশেন, তা হোলে প্রথমেই জাত্যভিমান ত্যাগ করেন ক্যান? যদি অন্য সমস্ত অভিমান ত্যাগ কোরে তার সঙ্গে জাত্যভিমান ত্যাগ করেন, তা হোলে তো কারু বলবার কোন কথা থাকে না, তা নৈলে তো অনেক লোকে অনেক কথা বোল্‌তে পারে।

দিশেঃ—তুই যা বোল্লি, তা ঠিক বটে, কিন্তু মোটামুটী বোল্‌তে গেলে জাতিতো কর্ম্মগত? তাহোলে যখন তাঁরা সকলেই এক কার্য্য, অর্থাৎ একই ধর্ম্মালোচনা ও ঈশ্বরচিন্তা করেন, তখন তো তাঁরা এক জাতিত্বই প্রাপ্ত হন, সুতরাং পূর্ব্বজাত্যভিমান ত্যাগ কোর্‌তে দোষ কি?

তুই কি কখন শিবের গাজন দেখিস্ নাই? শিবের গাজনে নানা জাতি সন্ন্যাসী হইয়া সকলেই শিবগোত্র প্রাপ্ত হয়।

তবে যাঁরা ঐরূপ ধর্ম্মালোচনাদি করিতে প্রথমে ব্রতী হন্, তৎকালে তো তাঁদের বিষয় বাসনা ও সংসার চিন্তা ত্যাগ হয় না, ধনলোলুপ ব্যক্তিগণের ন্যায় তাঁদিগে সংসার চিন্তায় রত থাক্‌তে হয়, তা হোলে তাঁরাতো নির্গুণ নিরাকার অথবা প্রকৃত বৈষ্ণব সাকার উপাসকগণের জাতি প্রাপ্ত হন্ না, সুতরাং তাঁদের ঐরূপ আচরণ করা কেবল জ্ঞানের বালকত্ব বৈ নয়।

কিন্তু তাঁহারা যদি প্রকৃত প্রস্তাবে নিয়ত ধর্ম্মালোচনা ও সাধুসঙ্গ করেন, তা হোলে ক্রমে ক্রমে যত তাঁহাদের জ্ঞান উন্নত হইবে, ততই আপনা-আপনিই তাঁদের সংসারচিন্তা ও বিষয়বাসনা এবং সমস্ত অভিমান ত্যাগ হইবে, সে জন্য তাঁহাদিগে আর চেষ্টা করিতে হইবে না এবং তাঁহাদের জ্ঞান নির্ম্মল হইলে, তাঁহারা অনায়াসে মুক্তি-পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন।

আর যে পর্য্যন্ত প্রবৃত্তি মন হইতে দূর না হয়, সে পর্য্যন্ত অন্তরে এক গূঢ় ভাব রাখিয়া বাহিরে সাধারণ লোকের ন্যায় আচরণ করা জ্ঞানেচ্ছু সাধকের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

ঐ সম্বন্ধে জনক রাজা ও বশিষ্ঠদেব বোল্‌ছিলেন যে ;—

বশিষ্ঠোক্তি,—

অন্তঃ সংত্যক্তসর্ব্বাশো বীতরাগো বিবাসনঃ ;
বহিঃসর্ব্বসমাচারো লোকে বিহর রাঘব ॥
অন্তর্বৈরাগ্য মাদায় বহীরাগোন্মুখঃ স্থিতঃ।
বহিস্তপ্তো হন্তরঃ শীতো লোকে বিহর রাঘব ॥
বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহির কর্ত্তা স্তরেবং বিহর রাঘব ॥

যো, বা, উ, প,

জনকোক্তি।—

অন্তর্ব্বিকল্পশূন্যস্য বহিঃসচ্ছন্দচারিণঃ।
ভ্রান্তস্যেব দশাস্তাস্তাস্তাদৃশা এব জানতে॥

জ, সং ১৫।৪

নিশেঃ—তুই যা বোল্লি এসব তো মোটা কথা, কিন্তু একটা বিষয়ে বড় গোলযোগ বোধ হোচ্চে যে, সাকার ও নিরাকার উপাসক এই দুই দলের মহাত্মারা যে সব কথা বার্ত্তা বলেন, তাতে বোধ হয় যে; সাকারবাদিদের মনের ভাব এই যে, প্রথমতঃ সাকার উপসনারি দ্বারা জ্ঞান বিশুদ্ধ কোর্‌তে না পার্‌লে, নিরাকার উপাসনা কর্‌বার অধিকার হয় না, এবং সে অধিকারী না হোয়ে নিরাকার চিন্তা কোর্‌তে গেলে, আকাশ ভাব্‌তে হয়, ও তাতে কোন ফলই হয় না এবং তাই বা কিরূপে ভাবা যেতে পারে? অতএব প্রথমতঃ সাকার উপাসনা করাই উচিত।

নিরাকারবাদিদের মনের ভাব যে, যখন ঈশ্বর নিরাকার বলিয়া সকল মুনি ঠাকুর ও মহাত্মাগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তখন একেবারে নিরাকার চিন্তা করাই উচিত, সাকার উপাসনার কোন ফল নাই।

তা, ভাই! সাকারবাদিরা ফল কামনা করিয়া সাকার ঈশ্বরের উপাসনা করেন, আর নিরাকারবাদীরাও নিরাকার ঈশ্বরের নিকট সুখ শান্তির প্রার্থনা করেন। কিন্তু সকল মুনি ঠাকুরাই তো সিদ্ধান্ত কোরেচেন যে, ঈশ্বর নিরাকার ও নির্গুণ, তাহোলে নির্গুণের দয়া প্রভৃতি গুণ থাকা তো সম্ভব নয়, তবে নিরাকারবাদিরা যখন ঈশ্বরকে "দয়াময়" বোলে সম্বোধন ও তাঁহার নিকট সুখ শান্তি পাইবার প্রার্থনা করেন, তখন সাকারে ও নিরাকারে তো বিশেষ প্রভেদ বোলে বোধ হয় না; কারণ কেউ ঈশ্বরের গুণ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে গুণবিশিষ্ট করেন, কেউ বা রূপ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে আকারবিশিষ্ট করেন। প্রকৃতার্থে আত্ম নির্ণয়পূর্ব্বক আপনার আকার লয় ও কল্পনা ত্যাগ করিতে না পারিলে প্রকৃত নিরাকার চিন্তা সম্ভব হয় না, কেননা

আকারের গুণই যে সে আকার টানে, সুতরাং আকার লয় কোর্তে পারলেই মন বিনষ্ট হইয়া কল্পনাশূন্য হয়, তখন আর নিরাকার চিন্তা করিতে হয় না, সমস্তই নিরাকারময় জ্ঞান হইয়া চিন্তাও লয়-প্রাপ্ত হয়। তুই তো সে দিন আটবাঁকা ঠাকুরের কথা বোলেচিস্ যে।—

যদি দেহং পৃথক্ কৃত্বা চিতি বিশ্রাম্য তিষ্ঠসি।
অধুনৈব সুখী শান্তো বন্ধমুক্তো ভবিষ্যসি ॥

অ, অ, ১। ৩।

যদি তুমি দেহকে পৃথক করিয়া চিন্মাত্রে অবস্থান কর, তা হোলে এখনই সুখী শান্ত ও বন্ধনমুক্ত হইবে।

আবার জনক রাজাও বোলেছিলেম যে,—

অচিন্ত্যং চিন্ত্যমানোহপি চিন্তারূপো ভজত্যসৌ।
ত্যক্ত্বা তদ্ভাবনাং তস্মাদেব মেবাহমাস্থিতঃ।

আমি যদি সেই অচিন্ত্য ঈশ্বরকে (ব্রহ্মকে) চিন্তা করি, তাহা হইলে তাঁহাকে চিন্তার বিষয়ীভূত করা হয়, অতএব আমি ঈশ্বরচিন্তা ত্যাগ করিয়া এইরূপে অবস্থান করিতেছি।

অতএব ভাই! ঐ সব ভেবে ভেবে আমার মনে বড় গোল-যোগ উপস্থিত হইয়াছে।

দিব্যোঃ—তা হবেই তো আমাদের এখনও জ্ঞান বিশুদ্ধ হয় নাই, এখন ও সব কথাতো আমরা ঠিক কোরে বুঝ্তে পারবো না, আমাদের তো এই প্রথমকাণ্ড, সময়ান্তে আমাদের জ্ঞান বিশুদ্ধ হইলে দোসরা কাণ্ডে আমরা ওসব বিষয় ঠিক কোর্তে পারবো। এখন যেরূপ মোটা কথা চোল্‌চে, তাই চলুক।

পঞ্চম কারখানা।

নিশেঃ—আচ্ছা, তবে এখন মোটা কথাই জিজ্ঞাসা করি, তুই বল্লি যে, প্রবৃত্তি সমাজের বিষয়ানুরাগ বেড়েচে বোলেই তাদের ধর্ম্মা-লোচনা উঠে গ্যাচে, তা তাদের ঐরূপ বিষয়ানুরাগ বেড়েচে ক্যান ?

দিশেঃ— ব্রাহ্মণজন্মবশতঃ চারটী ঋণে ঋণী হইতে হয়, এবং ঐ চারটী ঋণ শোধ কর্‌বার নিমিত্ত ক্রমান্বয়ে চারটী আশ্রম অবলম্বন করিতে হয়।

প্রথমতঃ ঋষিঋণ পরিশোধ কর্‌বার নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম অব-লম্বন কোরে জ্ঞান লাভের জন্য বেদাদি-শাস্ত্র-অধ্যয়ন করিতে হয়, তার পর গার্হস্থ্য-আশ্রম গ্রহণ কোরে বিবাহ ও সন্তান উৎপাদন করণপূর্ব্বক পিতৃ-ঋণ শোধ করিতে হয়; তৎপরে বানপ্রস্থ আশ্রমে যজ্ঞাদি কার্য্যের দ্বারা দেব-ঋণ শোধ করিয়া, পরিশেষে আত্মঋণ শোধজন্য সর্ব্বত্যাগী হোয়ে, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ও মুক্তি লাভের নিমিত্ত সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতে হয়। আর ব্রাহ্মণগণ মননশীল, সেই জন্য তাঁহারা মুনি-পদ-বাচ্য।

অতএব পূর্ব্বতন মুনি ঋষিগণ যজ্ঞোপবীত সংস্কারের পরেই প্রথমতঃ ঐরূপ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম অবলম্বন করতঃ, বেদাদি শাস্ত্র অধ্য-য়ন দ্বারা জ্ঞানলাভ করিয়া, পরে পিতৃ-ঋণ শোধজন্য গার্হস্থ্য আশ্রম গ্রহণ এবং বিবাহ করিয়া পুত্র উৎপাদন করিতেন। সুতরাং স্ত্রী পুত্রাদিতে এবং বিষয়ে তাঁহাদের আসক্তি হইত না, তাঁহারা আসক্তি-শূন্য হৃদয়ে কেবল আপনাদের জীবিকা নির্ব্বাহ ও সন্ন্যাসিগণের পরি-চর্য্যাকরণোপযোগী উপার্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়া আপনাদের জীবন ধারণ, ও সন্ন্যাসিগণকে আশ্রয় প্রদান করতঃ তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিয়া, আপনারা নিয়ত ধর্ম্মালোচনা ও ঈশ্বরচিন্তায় রত থাকিতেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহাদের বালকগণকে তত্ত্বজ্ঞান-বিষয়ক নানা-

প্রকার উপদেশ দিতেন; এবং তাঁহাদের যজ্ঞোপবীত সংস্কারের পর তাঁহাদিকেও ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম অবলম্বন করাইতেন। তাঁহাদের স্ত্রীগণও সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, আসক্তিশূন্য-মনে কেবল পতিসেবায় রত থাকিয়া, সকল বিষয়েই পতির অনুগামী হইতেন; এই সকল তাঁহাদের গার্হস্থ্য আশ্রমের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল; এবং তৎকালে তাঁহাদের আসক্তি একেবারে নির্ম্মল হইত না।

তদনন্তর তাঁহারা দেবঋণ শোধজন্য যজ্ঞাদি করিতেন. এইরূপে ক্রমে যখন তাঁহাদের জ্ঞানোন্নতি ও মন নির্ম্মল হইয়া একেবারে তাঁহারা আসক্তিশূন্য হইতেন, তখন সর্ব্বত্যাগী হইয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করতঃ আত্মজ্ঞান সাধনা দ্বারা মন বিনাশ করিয়া মুক্তি লাভ করিতেন। আর যদি ঐ ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে কাহ জ্ঞান একবারে নির্ম্মল হইয়া মন আসক্তিশূন্য হইত, তাহোলে তিনি গার্হস্থ্য আশ্রমাদি উপেক্ষা করিয়া একেবারে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিতেন, যেমন শুকদেব প্রভৃতি করিয়াছিলেন, শুকদেব ঠাকুর ব্রহ্মচর্য্যও অবলম্বন করেন নাই। শুকদেব ঐ সম্বন্ধে জনক ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, একেবারে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিলে, গার্হস্থ্যাদি আশ্রম উপেক্ষা করা হেতু কি কোন প্রত্যবায় হইতে পারে? তদুত্তরে জনক ঋষি বলিয়াছিলেন যে, যদি ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে জ্ঞান নির্ম্মল ও বাসনা দূর হয়, তবে গার্হস্থ্য আশ্রমাদি উপেক্ষা করণজন্য কোন প্রত্যবায় হয় না। কারণ গৃহিগণের জন্যই বিধি এবং নিষেধ, কিন্তু যাহার জ্ঞান নির্ম্মল হইয়া বাসনা ত্যাগ হয়, তাহার পক্ষে নিষেধ বিধি, কি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এবং শাস্ত্রাশাস্ত্র কিছুই নাই।

আর ঐ গার্হস্থ্য আশ্রমী মুনিগণের মন ঈশ্বরচিন্তায় এরূপ আসক্ত ও রত থাকিত যে, ঐ বিষয়ের আন্দোলন ও চর্চ্চা ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কোন কার্য্যই ছিল না, এবং তাঁহারা আপনাদের বালকগণকেও ঐ ঈশ্বরবিষয়ক উপদেশ প্রদান ও তাহার আদর্শ প্রদর্শন জন্য নানা প্রকার ধর্ম্মনাটক রচনা করিয়া, বালকগণের সহিত সময়ে সময়ে ঐ

নাটক পাঠ ও তাহার অভিনয় করিতেন। ঐ সকল নাটক পরে পুরাণ বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

এখনও ঐ সকল নাটকে নানাপ্রকারে ঐ অভিনয়ের অভিনয় হইয়া থাকে। আর প্রবৃত্তিসমাজের গৃহিগণ ঐ নাটকের নায়ক-নায়িকাগণকে প্রকৃত মানুষ, অথবা দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু ঐ সকল নাটকের (পুরাণের) নায়কনায়িকাগণের জন্ম, ধর্ম, ও আকার প্রকারাদি যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ সকল নায়ক নায়িকা রচিত ও কল্পিত বলিয়াই মনে উদয় হয়, নতুবা অসম্ভব, অসঙ্গত ও অযৌক্তিক বিষয়কে সম্ভব, সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া কল্পনা না করিলে আর ঐ সকল নায়ক নায়িকাকে প্রকৃত মানুষ অথবা দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

ঋষিগণ ধর্ম এবং জ্ঞান বিষয়ক আপনাদের মনের কথা উক্ত নায়ক নায়িকার উক্তি বলিয়া রচনা করিয়াছেন। আবার কতকগুলি নায়িকাকে তাঁহারা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহারা অযোনি-সম্ভবা, যেমন দ্রৌপদী প্রভৃতি অর্থাৎ তাঁহাদের প্রকৃতি-সিদ্ধ জন্ম হয় নাই, সুতরাং তাঁরা মানুষ নন, ইহাতেও কি তাঁহাদিগে প্রকৃত মানুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে?

ঈশ্বরচিন্তাকারী সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায় ঐ নায়ক নায়িকা-গণের আকারাদি সম্বন্ধে অনেকাংশ মিথ্যা বলিয়া তাঁদের ক্ষমতাদি প্রদর্শনজন্য রূপক করিয়া প্রশংসাবাক্যে ঐরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে—বলেন, পুরাণকে রচিত নাটক ও তাহার অভিনেতাগণকে কল্পিত নায়ক বলিতে সাহস করেন না, কিন্তু পুরাণসকল যে, মহাত্মা ব্যক্তি-গণের রচিত, তাহা সকলেই স্বীকার করেন, তবুও তাহার (পুরা-ণের) অভিনেতাগণকে রচিত নায়ক নায়িকা ও পুরাণকে নাটক বলা হবে না; রচনার অর্থ যে তাঁরা কি বোঝেন, তা পাগলেরা বুঝবে কি?

আর ঐ ঈশ্বরচিন্তাকারী সম্প্রদায় যে, পুরাণকে নাটক বলিতে সাহস করেন না, তাহার কারণ বোধ হয় যে, হয় তাঁরা উপরোক্ত

রচনা শব্দের কোন সূক্ষ্ম অর্থ বুঝিয়া পুরাণের রচিত ইতিহাসকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন, অথবা প্রবৃত্তিসমাজের প্রায় সকলের মনে পুরাণের বর্ণিত বিষয়সকল সত্য বলিয়া যে প্রকার বদ্ধমূল হইয়াছে, তাহা সহজে তাঁহাদের মন হইতে দূর করা সুকঠিন, সেই জন্য একেবারে পুরাণকে নাটক বলিলে, পাছে ভক্তির ত্রুটি হইয়া তাঁরা তাঁদের দলে না আসেন এই আশঙ্কায় ঐরূপ সাহস করেন না। ফলে নিবৃত্তির চক্ষে দেখলে সব ধাঁধা দূর হয়।

কিন্তু নিরাকারবাদিদের অকুতঃসাহস, তাঁদের কোন ভয় নাই, তাঁরা একেবারেই পুরাণকে মিথ্যা বলেন এবং পুরাণাদিকে মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস না করিলে, কেহ তাঁহাদের দলভুক্ত হইতে পারেন না, তাঁদের প্রথম উপদেশই যে, পুরাণ আদিকে মিথ্যা জ্ঞান কর।

আর পাগলের কোন বিষয়ে ভয় কি লজ্জা নাই, সুতরাং সে মনের কথা গোপন রাখতে পারবে কেন? ফলে পাগল কোন সম্প্রদায়ী নয়, সে কেবল পাগলের দল খুঁজে বেড়ায়।

এখন আসল কথা, প্রবৃত্তিসমাজের ঠাকুরগণ পার্ব্বতন মুনি ঋষিগণের আচরণের অন্যথায় যজ্ঞোপবীত (উপনয়ন) সংস্কারের দ্বারা বেদাদি অধ্যয়নজন্য আচার্য্যসমীপে নীত না হইয়া এবং বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ জ্ঞানলাভ না করিয়া একেবারেই গার্হস্থ্য আশ্রম গ্রহণ করেন, কিন্তু ঐ উপনয়নকালে গুরুগৃহে যাবার অভিনয় টুকু করা হয়। আর গার্হস্থ্য আশ্রম গ্রহণ করিয়া তাঁহারা চিরকালই পিতৃঋণ শোধ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, কেবল পিতৃঋণই শোধ করিতে থাকেন, তাঁদের পিতৃঋণ শোধের আশা আর মেটে না; সুতরাং তাঁদের আশ্রমভ্রষ্ট হওয়া হেতু তাঁহারা কেবল বিষয়ানুরাগী হইয়া সংসারচিন্তাতেই সর্ব্বদা উন্মত্ত থাকেন, এবং তাঁহারা যে কোন কার্য্য করেন, উদ্দেশ্য কেবল ধন উপার্জ্জন ভিন্ন আর কিছুই নয়। প্রকৃত ধর্ম্মালোচনা ও ঈশ্বরচিন্তা করিতে তাঁদের একবারও মতি হয় না, তবে কোন কোন মহাত্মা বলেন যে, আমরা পিতৃপিতামহাদির কার্য্যের অনুকরণ করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিকাদি করি, এবং ঐ কথার পোষকতায় বচন আওড়ান যে,—

মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।

বস্তুতঃ যদি তাঁরা প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম অবলম্বন কোরে জ্ঞান লাভ কোর্‌তেন, তা হোলে তাঁরা মহাজনের (সাধুর) অর্থ পিতৃপিতামহাদি বুঝিতেন না। শঙ্কর ঠাকুর সাধুর লক্ষণ যা বোলেছিলেন, তা তো আমি আগে বোলেচি সে কথাটা কি তোর মনে নাই?

মূল কথা, আশ্রমভ্রষ্ট হওয়ার জন্য তাঁদের সমস্ত কার্য্যই ভ্রষ্ট, সন্ধ্যা আহ্নিকাদি সম্বন্ধে তাঁরা কেবল চিনির বলদ মাত্র।

কিন্তু বড় মুখ জোর; কেউ কেউ বলেন যে, কলিকালে নামই সত্য, আমি হরির নামের মালা নিয়ে জপ্‌ করি, অথচ যখন তিনি জপ করেন, তখন মালাও ফিরেন, আবার লোকের সঙ্গে বিষয় ব্যাপারের কথাও কন।

আবার কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, আমি গোপনে ইষ্ট-মন্ত্র জপ্‌ করি, তাঁর তো পুঁজির মধ্যে সেই ব্যবসায়ী গুরু কাণে কাণে এক মন্ত্র ফুঁকে দিয়ে গ্যাচেন বৈ নয়। তা ভিন্ন তিনি আর কোন উপদেশ পান নাই এবং সাধুসঙ্গও করেন নাই, সুতরাং মন্ত্র যে কি, আর জপই বা কি, তা যে তিনি কত দূর বুঝেচেন, তার আর বোল্‌বো কি? তুই তো সব বুঝ্‌তেই পেরেচিস। আরও কতক গুলি লোক বলেন যে, সত্য বলা এবং চুরি, অপহরণ, প্রবঞ্চনা আদি না করাই ধর্ম্ম; কিন্তু পাগল বলে যে, ঐ সমস্ত কার্য্যের সহিত আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই, ঐ সকল কার্য্য কেবল সাংসারিক ও বাহ্যিক শান্তি রক্ষার নিয়ম ও নীতি; কারণ ঐ সকল কার্য্য করিলে সাংসারিক বিষয় এবং একত্রে বাসকরণ সম্বন্ধে শান্তি ভঙ্গ হয় না ও বিষয় কারবার বেশ সুচারু মতে চলে, তবে বাহ্যিক শান্তি লাভে মনের শান্তি যত দূর হইতে পারে, তাহা হয়। তুই তো অশৌচের বিষয় বলবার সময় ও কথা বেশ কোরে বোলেচিস, আমার আর বলবার প্রয়োজন নাই, ফলে ফলবোধ না হোলে কোন কার্য্যের ফল হয় না।

আবার কয়েকজন বোলেন যে,—

যদি অদ্বৈতবাদিদের মতে এই জগৎপ্রপঞ্চ ও অহঙ্কার (আমি কর্ত্তা ও ভোক্তা ইত্যাকার জ্ঞান) মিথ্যা, আত্মাই সত্য, এইরূপ জ্ঞান সিদ্ধির দ্বারা চিন্মাত্রে অবস্থিতি করাকে, এবং দ্বৈতবাদিদের মতে নিরাকার ঈশ্বরই সর্ব্বনির্ম্মাণকর্ত্তা, জগৎপিতা ও সকলের প্রভু, ইত্যাকার জ্ঞান সিদ্ধি করিয়া ঐ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করাকে মুক্তি বলে, তা হোলে একমতে কেবল এক ও আর একমতে দুই, আবার সেই ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করা তাও এক বোল্লেই হয়। অতএব এরূপ মুক্তিতে সুখ কি? তাতো বুঝ্তে পারিনে। যদি কিছু সুখ থাকে, তাও তো কারু দেখ্বার যো নাই; সুখ যদি লোকেই না দেখে, তবে সুখে আর দুঃখে তফাৎ কি? সে সুখও যা, দুঃখও তাই, দুইই সমান। আমাদের পক্ষে খুব ঐশ্বর্য্য হয় এবং লোকে তা দেখে বড় মানুষ বলে, স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবার থাকে, কোন বিষয়েরই অভাব থাকে না; তবে আমাদের সুখ বোধ হয় ও আমরা তাকেই সুখ বোলি, আমরা ঐ রকম মুক্তি চাই না। আর যে ঈশ্বরের রূপ নাই, গুণ নাই, সে ঈশ্বরকে কি আত্ম সমর্পণ কোরতে পারা যায়? আমরা যখন কোন ব্যক্তির রূপ গুণ ও বিষয় না থাকলে তাঁকে কন্যা সমর্পণই কোরতে পারিনে, তখন নিরাকার নির্গুণ নির্বিষয়ী ঈশ্বরকে কি কোরে আত্ম সমর্পণ কোর্বো? ওরূপ আত্ম সমর্পণ করা অপেক্ষা আত্মার হাতে পায়ে বেন্ধে তাকে জলে ফেলে দেওয়াই ভাল।

আরও শুনেচি যে, মুক্তি লাভ কোরতে হোলে আগে নিঃসঙ্গ হোয়ে যোগ সাধনা কোরতে হয়, তা একলা কি থাকতে পারা যায়? ঐ বিষয়ের অভিনয়স্বরূপ পৈতের (যজ্ঞোপবীত সংস্কারের) সময় তিন দিন একলা ঘরে থাকতেই মন উমুড়ি গুমুড়ি করে, তবুও তখন বিয়ে হয় না।

যা হোক, আমরা মাগ ছেলে নিয়ে বেশ থাচ্চি দাচ্চি, এই আমাদের যথেষ্ট সুখ।

এই তো এঁদের কথা। আবার যাঁরা পিতৃপিতামহাদির কার্য্যের অনুকরণ করেন, বলেন, তাঁদেরও এ অনুকরণ করা কেবল

"দাদার আকর পিণ্ডে মূত্র", ও "বেরাল বেঙ্কে শ্রাদ্ধ করার" ন্যায় বৈ নয়।

আর অন্যান্য বর্ণ সকলেরও আপন আপন আশ্রমবিহিত কর্ম্ম ও ধর্মভ্রষ্ট হওয়ায় তাঁহারাও কেবল সংসারে আসক্ত ও বিষয়ানুরাগী হইয়াছেন।

প্রায় সকল লোকই সংসারমায়ায় এরূপ মুগ্ধ যে, তাঁরা যে কোন কাযই কোর্‌তে থাকুন না কেন, ছেলে একবার বাবা বোলে ডাকলেই সব কায ঘুরে যায়, ওমনি চক্ষু স্থির।

সেদিন রামচন্দ্র বর্ম্মা বশিষ্ঠ দেবের কাছে ঐ সব লোকের কথা বোল্‌তে বোল্‌তে ওমনি কেঁদে ফেল্লেন।

ফল কথা, আশ্রম ও আশ্রমবিহিত কর্ম্মভ্রষ্ট হওনা হেতু প্রবৃত্তি-সমাজে সাধারণ লোকেদের বিষয়ানুরাগ ও সংসারাসক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া ধর্ম্মালোচনা লোপ হইয়াছে।

কিন্তু যখন প্রকৃতিবিকারে জাত্যন্তরপরিণাম পূরণ, অর্থাৎ সাধনার দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, তখন সকলেরই একেবারে ঐরূপ ধর্ম্ম লোপ হইবার যো নাই।

এক্ষণে পুরাণসম্বন্ধে আর একটু বোল্‌তে হোচ্চে।

পুরাণে কর্ণ ও পাণ্ডবগণের জন্মবৃত্তান্ত শুন্‌লেই বোধ হয় যে, তাঁদের জন্ম প্রকৃতিসম্ভব নয়, সমস্তই অমানুষিক। আর দেবতাদের বরে উক্ত পুরাণের কোন কোন নায়ক অমর ও কাহারও ইচ্ছামৃত্যু হইয়াছিল; মূলে ঐ বিষয়টী অসম্ভব নয়, কারণ নিয়ম প্রতিপালন এবং সাধনা ও অভ্যাস দ্বারায় প্রকৃতিকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে পারিলে প্রকৃতির আর বিকার হয় না, সুতরাং তদ্দ্বারা অমর ও ইচ্ছামৃত্যু হইতে পারে। ফলকথা, পুরাণ তো প্রকৃত ইতিহাস, কি তল্লিখিত ব্যক্তিগণের জীবনী নহে; ইহা কেবল গার্হস্থ্য আশ্রমিগণকে ঐ আশ্রমের নিয়ম, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্মসম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ ও তৎসম্বন্ধে দৃষ্টান্ত রচনা করা হইয়াছে, এবং ইহাতে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানেরও অনেক উপদেশ আছে।

আর পাণ্ডবদের বিবাহ এবং স্ত্রীসঙ্গ করার বিষয় বিবেচনা কোরলে ঐ ব্যাপার কখনই মানুষিক বলিয়া বোধ হয় না।

যদি বল, ঐ নায়ক নায়িকাগণ দেবতা, তা হোলে যাঁহারা কামনা ও তপস্যাদির দ্বারা সুখ ভোগ করবার জন্য স্বর্গ লাভ করেন, তাঁরাই দেবতা, তবে ঐ নায়ক নায়িকাগণ সামান্য বিষয়ের জন্য নানারূপ শোক, তাপ পাইয়া এত দুঃখ ভোগ করিলেন ক্যানে?

তা হোলে তাঁরা তো দেবতাও নন, তবে যখন তাঁরা দেবতাও হোলেন না, মানুষও হোলেন না, তখন তাঁহাদিগে নাটকের কল্পিত ও রচিত নায়ক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

মূলকথা, পুরাণ প্রকৃতই হোক আর নাটকই হোক, কিন্তু তাহা হইতে গার্হস্থ্য আশ্রমের ধর্ম্ম কর্ম্মাদি বিষয়ের এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক উপদেশ ও সেই বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

পাণ্ডবদের বিবাহ ও স্ত্রীসঙ্গ করার বিষয় দেখে এই উপদেশ পাওয়া যায় যে, গৃহীর স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত নয়, কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্য বিবাহ করিতে হয়। ইহাই তাহার দৃষ্টান্ত।

কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ দৃষ্টে এই উপদেশ—যে, আপন-প্রাপ্য বিষয় সহজে ত্যাগ করা উচিত নয়, সেই জন্য যত দূর পারা যায়, চেষ্টা করা উচিত।

অর্জ্জুনের বৈরাগ্যোদয় এবং রণস্থলে শরাসন ত্যাগ করায় এই উপদেশ—যে, সামান্য বিষয়ের জন্য বেশী বিবাদ ও অর্থ নষ্ট করা উচিত নয়।

এইরূপ বিশেষ কোরে একটু বিবেচনার সহিত দেখলে ইহার পদে পদে কেবল উপদেশ ও দৃষ্টান্ত বৈ আর কিছুই নয়। তবে গ্রহণ করবার অধিকার চাই।

শিষ্যঃ—অর্জ্জুনের মনে বৈরাগ্য উদয় হওয়ায় যখন রণস্থলে ধনুর্ব্বাণ ফেলিলেন, তখন তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দ্বারা তাঁহার এ বৈরাগ্য ঘুচাইয়া পুনরায় তাহাকে যুদ্ধে ব্রতী করা হইল, এরূপ রচনা করার তাৎপর্য্য কি?

দিশেঃ—এ গার্হস্থ্য আশ্রমী মুনি ঠাকুরগণ যোগী এবং তত্ত্বজ্ঞানীও ছিলেন, তাঁহাদের এ যোগ ও তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রচার করিবার জন্য ঐ নাটকে কৃষ্ণনামে এক নায়ক রচনা করিয়া তাঁহার দ্বারা ঐ তত্ত্বজ্ঞান ও যোগ প্রচারচ্ছলে অর্জ্জুনকে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তাঁহার বৈরাগ্য তিরোহিত করা, রচনা করা হইয়াছিল। তাঁহারা ঐরূপে কৃষ্ণের উক্তি বলিয়া যে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাই ভগবদ্গীতা বলিয়া খ্যাত হইয়াছে।

অর্জ্জুনকে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দেওয়া হয় নাই, তাহোলে যে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশে এবং সাধনা ও অভ্যাস দ্বারা অনেক ক্লেশে মনে বৈরাগ্য ও বিবেক আনিতে হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশে অর্জ্জুনের উপস্থিত-হওয়া বৈরাগ্য ও বিবেক দূরীকৃত হইল? এই কি সম্ভব? আরও দেখ, ঐ গীতা কি প্রণালীতে প্রচার হইয়াছে। যথা—ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমার পুত্র দুর্য্যোধনাদি এবং পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরাদি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেচ্ছায় একত্রিত হইয়া কি করিতেছেন? এইরূপ প্রশ্ন এবং সঞ্জয়ের উক্তি দ্বারা সমস্ত ভগবদ্গীতা প্রকাশ হইয়াছে।

আর ঐ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১শ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী বলেন যে, সংসারই দুঃখের মূল, কেবল সন্ন্যাস পূর্ব্বক আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা ব্যতিরেকে সেই দুঃখ নিবারিত হইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া ভগবান্ বাসুদেব লোকের প্রতি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে উপলক্ষ করিয়া সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রচার করিয়াছিলেন।

আর পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা, বিষয় সম্বন্ধীয় যুদ্ধে অর্জ্জুনদের পক্ষ হইয়া নানা প্রকার কৌশলের দ্বারায় তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, ইহাই বা কতদূর সঙ্গত?

এই সকল বিবেচনা করিয়া যাহার মনে যেরূপ উদয় হয়, তিনি সেইরূপ সিদ্ধান্ত করুন। কিন্তু পাগলে বলে যে, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের, যুদ্ধে অর্জ্জুনেদের সহায় হইয়া কুরুকুল বিনাশ করা রচনা দ্বারায় গার্হস্থ্য আশ্রমিগণকে এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, অন্যায়

সেই সব পুথি দেখিয়া যজমান-বাটীতে দশকর্ম্ম করাইতেন। এক-দিন এক যজমানের পিতৃশ্রাদ্ধ করাইতেছেন। প্রকৃত পক্ষে পিণ্ড-দানের পর পিণ্ডে সূত্র দিতে হয়। কিন্তু পুথিতে ঐ সূত্র শব্দের 'স'য়ের পুটলিটী একটু গোলাকার হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ যজমানকে পিণ্ডদান করাইয়া ঐ "স" কে "ম" সিদ্ধান্ত করিয়া পুঁথিতে মূত্র লেখা আছে স্থির করিলেন এবং তাহা দাদার হাতের লেখা কখন অন্যথা হইবার নহে এই বোলে যজমানকে পিণ্ডে মোতাইয়াছিলেন।

ষষ্ঠ কারখানা।

নিশেঃ—ভাই! তুই যে সে দিন সদ্গুরুর কথা বোলেছিলি, তা সদ্গুরু কাকে বলে?

দিশেঃ—যিনি এই জগতে সৎ ও অসৎ বস্তুর নির্ণয়করণপূর্ব্বক সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া জ্ঞান ও জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনিই সদ্গুরু। আর যদি প্রকৃতিবিকারে, অথবা ধর্ম্মালোচনাদির দ্বারা কোন ব্যক্তির জ্ঞানোদয় হইয়া, এই জগতে নিত্য বস্তু যে কি, তাহা তাঁহার জানিতে তীক্ষ্ণ ইচ্ছা হয় এবং তিনি ঐ বিষয়ের উপ-দেশ আকাঙ্ক্ষী হইয়া, ঐ সদ্গুরুর শরণাগত হন, ও গুরু যদি তাঁহার জ্ঞান, অধিকার ও আকাঙ্ক্ষা বেশ বুঝ্তে পারেন, তখন তাঁর প্রতি তাঁর কৃপা হয়, এবং ঐ সকল বিষয়ের উপদেশ তাঁহাকে প্রদান করেন, ঐ উপদেশগ্রহণকারী ব্যক্তিই শিষ্য। শিষ্য যদি গুরুবাক্যে বিশ্বাস ও তাঁহার উপদেশমতে কার্য্য করেন, তাহোলেই তিনি কৃতার্থ হইতে পারেন।

ঐ সম্বন্ধে কপিলদেব * কয়েকটি চুটকী কথা বোলেন—যে,

জীবন্মুক্তশ্চ।

সাং, দ, ৩। ৭৮.

উপদেশ্যোপদেষ্টৃত্বাৎ তৎসিদ্ধিঃ ॥

সাং, দ, ৩। ৭৯

বিজ্ঞানভিক্ষু † ঠাকুর ঐ কথা যা বুঝিয়ে দিলেন, তার তাৎপর্য্য এই যে, জীবন্মুক্ত পুরুষেরা উপদেষ্টা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁদের উপদেশ মতে কার্য্য করিলে, সিদ্ধি লাভ হইতে পারে।

আবার শিষ্যসম্বন্ধের চুটকী কথা যে,—

ন মলিনচেতস্যুপদেশবীজপ্ররোহোঽজবৎ ॥

সাং, দ, ৪।২৯।

ভাষ্যকার ঠাকুর ও কথাটি বুঝিয়ে দিলেন যে, যাদের মন রাগাদি দোষে মলিন হইয়াছে, সেই মনরূপ ভূমিতে জ্ঞানরূপ বৃক্ষের বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে না, যেমন অজরাজের হইয়াছিল।

কিন্তু প্রবৃত্তিসমাজে গুরুশিষ্যসম্বন্ধে এ রূপ নিয়ম নয়! ঐ সমাজে কতকগুলি ব্যবসায়ী গুরু আছেন, এবং বংশপরম্পরায় তাঁদের গুরুশিষ্যসম্বন্ধ একেবারে বাঁধা আছে, যেরূপ বিষয়সম্পত্তিসম্বন্ধে দায়ভাগমতে উত্তরাধিকারিদের নিয়ম, গুরুশিষ্যসম্বন্ধেও সেইরূপ নিয়ম চলিতেছে, এবং বিষয়সম্পত্তির পরিচয় দিবার সময় তাঁহারা শিষ্যযজমানকেও সম্পত্তি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং তাঁরা কুলগুরু বলিয়া খ্যাত, কোন মতে ছাড়াছাড়ির যো নাই, বরং ছাড়িলে মহাপাপ হয় বলিয়া শাসন আছে।

* সাংখ্যদর্শনের প্রণেতা।

† সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যকার।

ইহার কারণ বোধ হয় যে, পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি উপরোক্ত মত সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন, পরে ক্রমে ক্রমে যখন গার্হস্থ্য আশ্রমি-গণ আশ্রম ও ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়া বিষয়ে গাঢ় অনুরক্ত হইলেন, তখন অবিদ্যা-জন্য তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত ঈশ্বরভক্তি ও সদুপদেশ গ্রহণ করা উঠিয়া গেল, কিন্তু পুরুষপরম্পরায় ঐ রূপ গুরু-শিষ্যসম্বন্ধ আর উঠিল না, সাংসারিক বিষয়ের অন্যান্য সম্বন্ধের ন্যায় ঐ সম্বন্ধ চলিতে লাগিল, এবং গুরুশিষ্যের মধ্যে প্রকৃত ভাব উঠিয়া গিয়া, ঐ কার্য্য বিষয়কার্য্যের মধ্যে একটী কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইল। এখন আর শিষ্যকে গুরু অনুসন্ধান কি উপদেশ প্রার্থনা করিতে হয় না, গুরুই আপনার ব্যবসায়ের কার্য্যানুরূপ চেষ্টা করিয়া, আপনার পিতৃ-পিতামহাদির নিকট সৎ বস্তু বলিয়া যে সকল দেব ও দেবীর নাম শুনিয়া এবং শিখিয়া রাখিয়াছেন, তাদের মধ্যে কোন এক দেব কি দেবীর নাম বলিয়া, এই দেব কি দেবী নিত্য বস্তু এবং ইনিই তোমার উপাস্য দেবতা হইলেন তুমি এই দেবতার উপাসনা ও ধ্যান করিবে, এই সকল কথা বোলে দেন; একেই মন্ত্র দেওয়া বলে। তার পর শিষ্য যা করুন তা করুন, এই পর্য্যন্ত গুরুশিষ্যের কার্য্য সমাপ্ত ও সম্বন্ধ কাটা হইল। এখন কেবল সাধারণ সমাজের লৌকিকতার ন্যায় ঐ সম্বন্ধের আদান প্রদান চলিতে লাগিল।

নিশেঃ—ঐ ব্যবসায়ী গুরুর উপদেশমতে গুরুবাক্যে বিশ্বাস করিয়া; তিনি যে উপাস্য দেবতা বলিয়া দেন, ঐ দেবতার ধ্যান করিলে, শিষ্য কি কোন ফল পান না?

দিশেঃ—শিষ্যের যদি প্রকৃতিবিকারবশতঃ আত্মতত্ত্ব এবং জ্ঞানোদয় হয়, তাহা হইলে ঐ জ্ঞান যত উন্নত হইতে থাকে, ক্রমে তাঁহার মনে বিবেক ও বৈরাগ্য উদয় হয় এবং বিষয়ানুরাগ তাঁহার মন হইতে দূর হয়। তখন ঐ দেবতার ধ্যান করিতে করিতে তাহা সিদ্ধি হইলে ঐ দেবতা সাক্ষাৎকার হন, এবং সেই সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান জন্মে। আমি যে দেবতা সাক্ষাৎকার হন বোল্লাম, তা যে

ঐ দেবতা এসে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়ান, তা নয়। তবে ঐ বস্তু নিত্য এবং দুঃখরহিত কি না, তাহা তিনি জানিতে পারেন ও তাঁহার সেই জ্ঞান হয়। তখন যদি ঐ বস্তু সৎ ও দুঃখরহিত এবং নির্গুণ বলিয়া তিনি জানিতে পারেন ও সেই রূপ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে ঐ জ্ঞানের দ্বারায় তাঁহার মুক্তি লাভ হইতে পারে। মূল কথা, নির্গুণ-উপাসনাভিন্ন সাক্ষাৎজ্ঞান লাভ হয় না এবং সাক্ষাৎজ্ঞান না হইলেও মুক্তি হয় না। আর সগুণ উপাসনা দ্বারা ঐ রূপ সাক্ষাৎ-জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। কিন্তু যদি ঐ বস্তুকে সুখদুঃখজনিত অবিদ্যা বলিয়া তাঁহার জ্ঞান হয়, তা হোলে আর কোন ফলই হয় না, অর্থাৎ তিনি সাক্ষাৎজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না। তবে তাহাতে তাঁহার কেবল এই পর্য্যন্ত উপকার হয় যে, একবার ধ্যান সিদ্ধি হওয়া হেতু তাঁহার ধারণা এরূপ দৃঢ় থাকে যে, অন্য বস্তুর ধ্যান সিদ্ধি করিতে তাঁহাকে আর ক্লেশ পাইতে হয় না, অনায়াসেই ধ্যান সিদ্ধি হয়। তখন এই জগতে যে, কোন্ বস্তু সৎ ও নিত্য এবং নির্মল ও দুঃখরহিত, তাহা জানিবার জন্য চেষ্টা করিতে করিতে উপরোক্ত মত সৎ গুরুর উপদেশ পাইলে, তিনি নির্গুণ উপাসনা দ্বারায় সাক্ষাৎ জ্ঞান ও তদ্দারায় মুক্তি লাভ করিতে পারেন।

আর ঐরূপ সদ্‌গুরুর উপদেশ পাইবার পূর্ব্বে যদি জ্ঞানালোচনা দ্বারা তাঁহার জ্ঞান নির্মল হইয়া "আমি", অর্থাৎ অহঙ্কারের প্রতি দৃষ্টি হয়, এবং তাহা আলোচনা ও আন্দোলন করিয়া আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তাহা হোলেই তিনি বন্ধনমুক্ত হইবেন। এই অবস্থার জ্ঞানকেই গুরু বলা যায়।

আর আমি যে, সৎ এবং নিত্য বস্তুর উল্লেখ করিলাম, ওটা মোটা মুটি কথা মাত্র।

শিষ্য।—তুই যে সাধনচতুষ্টয় বোলি, ঐ সাধনচতুষ্টয় কাকে বলে? আর কিরূপেই বা ঐ সাধনা করবার অধিকার হয়?

শিষ্য।—আপন আপন বর্ণের আশ্রমবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত

থাকিয়া, ব্রতাদি তপস্যা করতঃ সর্ব্বেশ্বরের মনকে পরিতুষ্ট করিতে পারিলে, ঐ সাধনচতুষ্টয়ে ব্রতী হইবার অধিকার হয়। যথা,—

স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মেণ তপসা হরিতোষণাৎ।
সাধনং প্রভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদিচতুষ্টয়ং ॥

শঙ্কর ঠাকুর।

সাধনচতুষ্টয়, চারিটী সাধনা। যথা—"নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক", "ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ", "শম দমাদিষট্‌কসম্পত্তি" ও "মুমুক্ষুত্ব" ইহার মধ্যে, শম, দমাদি ষট্‌ক সম্পত্তি ছয়টি, যথা।—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধান—সর্ব্বশুদ্ধ নয়টি।

প্রথম। "নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক" সকল বস্তুই ক্ষণস্থায়ী ও অনিত্য, কেবল এক ব্রহ্ম (আত্মা) নিত্য, এইরূপ নিশ্চয়জ্ঞানকে বিবেক বলে।

নিত্যমাত্মস্বরূপং হি দৃশ্যং তদ্বিপরীতগং।
এবং যো নিশ্চয়ঃ সম্যগ্বিবেকো বস্তুনঃ স বৈ ॥

শঙ্কর ঠাকুর।

দ্বিতীয়। "ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগ" সকল বিষয়ে, কার্য্যে এবং ফলভোগে-আস্থা ও ইচ্ছা না থাকা, যেমন কাকবিষ্ঠাতে কাহারও ইচ্ছা হয় না, ইহাকে বৈরাগ্য বলে। যথা,—

ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বৈরাগ্যবিষয়েষ্বনু।
যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্ম্মলং॥

তা হোলেই প্রথমতঃ আশ্রমবিহিত কার্য্যানুষ্ঠান এবং সাধনা ও অভ্যাসাদি-দ্বারা মনকে স্থির করিতে পারিলে, মনে বিবেকের উদয় হয়, অর্থাৎ এক ব্রহ্মই নিত্য তদ্ভিন্ন সমস্ত বস্তু ক্ষণস্থায়ী এবং অনিত্য বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান হয়, এবং এ জ্ঞান সিদ্ধি হইলে, মনে বৈরাগ্য উদয় হয়, অর্থাৎ কেবল এক ব্রহ্ম (আত্মা) ভিন্ন আর কোন বস্তুতে,

কার্য্যে এবং ফলভোগে ইচ্ছা ও আস্থা থাকে না, সুতরাং বিবেক হইতে বৈরাগ্য হয়, অতএব বিবেকই বৈরাগ্যের কারণ।

তৃতীয়। শম, দমাদি ষট্‌ক সম্পত্তি।

১। "শম"——মনো নিগ্রহ।

২। "দম"——ইন্দ্রিয় নিগ্রহ।

ইন্দ্রিয় দশ এবং সঙ্কল্পেন্দ্রিয় মন শুদ্ধ একাদশ ইন্দ্রিয়।

পঞ্চ বাক্যেন্দ্রিয়। যথা,—"মুখ, অর্থাৎ বাগিন্দ্রিয়", বাক্যপ্রয়োগের করণ; "হস্ত, গ্রহণেন্দ্রিয়", দ্রব্য গ্রহণের করণ. "পাদ, গমনেন্দ্রিয়"। "উপস্থ" আনন্দভোগের করণ। "পায়" মলাদিনিঃসরণের করণ।

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। যথা।—"চক্ষু", দর্শন ক্রিয়ার করণ; "কর্ণ", শ্রবণব্যাপারের করণ; "জিহ্বা"। রসাস্বাদনের করণ; "নাসিকা" গন্ধগ্রহণের করণ; "চর্ম্ম" স্পর্শগ্রহণের করণ; এবং আত্মার যে সঙ্কল্প হয়, তাহাতে মনের করণতাপ্রযুক্ত মন সঙ্কল্পেন্দ্রিয়।

সদৈব বাসনাত্যাগঃ সমোঽয়মিতি শব্দিতঃ।
নিগ্রহোবাহ্যবৃত্তীনাং দম-ইত্যভিধীয়তে॥

সঙ্কল্পেন্দ্রিয় মনই উক্ত দশ ইন্দ্রিয়ের প্রবর্ত্তক। মন প্রবৃত্তি না দিলে ঐ ইন্দ্রিয়গণ কর্ম্মণ্য হইতে পারে না।

অতএব বৈরাগ্যসাধন সিদ্ধি হইলেই আর কোন বস্তুতে, কার্য্যে কি ফলভোগে আস্থা ও ইচ্ছা একেবারে ঘুচিয়া যায়, সুতরাং মন কল্পনাশূন্য হয় এবং ইন্দ্রিয়গণ আপনিই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। অতএব বৈরাগ্যই মনের কল্পনাশূন্য হওয়ার কারণ; এবং মনের কল্পনাশূন্য হওয়াই ইন্দ্রিয়গণের অকর্ম্মণ্য হইবার কারণ হইতেছে। এই সম্বন্ধে মনুঠাকুর বলিয়াছেন যে,—

একাদশং মনোজ্ঞেয়ং স্বগুণেনোভয়াত্মকম্।
যস্মিন্ জিতে জিতাবেতৌ ভবতঃ পঞ্চকৌ গণৌ॥

৩। "উপরতি", কর্ম্মত্যাগ। কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধে শ্রবণ মননাদি একেবারে লয় হয় না।

বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্তিঃ পরমোপরতির্হি সা।

মন সঙ্কল্পশূন্য হইলে, ইন্দ্রিয়গণ অকর্ম্মণ্য হয়, সুতরাং সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ হয়, ইহাতে মনের সঙ্কল্পশূন্য হওয়াই কর্ম্মত্যাগের, অর্থাৎ উপরতির কারণ।

৪। "তিতিক্ষা" শীত-উষ্ণ এবং সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্ব সহ্য করণ।

সহনং সর্ব্বদুঃখানাং তিতিক্ষা সা শুভা মতা।

উপরতি সিদ্ধি হইলেই সকল কর্ম্ম ত্যাগ হয়, সুতরাং তখন শীত-উষ্ণ এবং সুখ-দুঃখ দ্বন্দ্ব অনায়াসেই সহ্য করিতে পারা যায়। তাহা হইলে উপরতি তিতিক্ষার কারণ হইতেছে।

তিতিক্ষাসাধনা সিদ্ধি হইলে, তবে শিষ্য হইবার, অর্থাৎ গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিবার, অধিকার জন্মে, তখন গুরু অন্বেষণ করিবার প্রয়োজন।

৫। "শ্রদ্ধা", গুরু এবং বেদাদি শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস। যথা,—

নিগমাচার্য্যবাক্যেষু ভক্তিঃ শ্রদ্ধেতি বিশ্রুতা।

শ্রদ্ধাসিদ্ধিতে গুরু এবং বেদান্তাদি শাস্ত্রে বিশ্বাস ও মনের একাগ্রতা জন্মে।

৬। "সমাধান" মনের একাগ্রতা। যথা—

চিত্তৈকাগ্র্যন্তু সল্লক্ষ্যে সমাধানমিতি স্মৃতং।

সমাধানসিদ্ধিতে মনের একাগ্রতা সিদ্ধি হইলেই মুক্তিতে দৃঢ় ইচ্ছা হয়।

চতুর্থ। "মুমুক্ষুত্ব", মুক্তিতে তীক্ষ্ণ ইচ্ছা, অর্থাৎ সংসারবন্ধন হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ হইবে, তাহার দৃঢ় চিন্তা হয়।

ইহাকেই সাধনচতুষ্টয় বলে।

ঐরূপ সাধনাযুক্ত ও স্বীয় মঙ্গলকামী পুরুষের আত্মতত্ত্বের জ্ঞান-সিদ্ধির জন্য বিচার করা বিধেয় হয়। যথা—

উক্তসাধনযুক্তেন বিচারঃ পুরুষেণ হি।
কর্ত্তব্যোজ্ঞানসিদ্ধার্থ মাত্মনঃ শুভমিচ্ছতা ॥

নিশেঃ—সেদিন জনক রাজা বোলেছিলেন যে, কৌপীনসত্ত্বে অকিঞ্চনতাজনিত স্বাস্থ্যলাভ অতিদুর্লভ, অতএব আমি ত্যাগ এবং গ্রহণ, এই উভয়কেই ত্যাগ করিয়া, যথাসুখে অবস্থান করিতেছি। যথা—

অকিঞ্চনভবং স্বাস্থ্যং কৌপীনত্বেঽপি দুর্লভং।
ত্যাগাদানং বিহায়াস্মাদহমাসে যথাসুখম্ ॥

তা, ভাই! ত্যাগ ও গ্রহণ, এই উভয়কে ত্যাগ করা কিরূপ, আমিতো তার কিছুই বুঝতে পারি নাই, সুধু বোঝা কেন, ও কথার ভেতরেই ঢুকতে পারি নাই। তুই একটু বেশ কোরে ভেবে চিন্তে দেখ দেখি, আমি একবার এখানকার হাট দেখে আসি; আর আমার একটা জিনিষের দরকার আছে, যদি পাই, তাও নিয়ে আসবো।

নিশুর প্রস্থান।

দিশেঃ—ঐ বিষয় ভাবতে ভাবতে দেখলে যে, বেলাতো অনে-কটা হোলো, একবার মনে কোল্লে যে, অনেক দিন * তো খাওয়া হয় নাই, কিছু ফলমূল ভিক্ষা কোরে খেলে হয় না? আবার মনে উদয় হোলো যে, নিশেতো হাটে গ্যাছে, সে না এলে, একলাই বা কি কোরে খাই, আবার মনে মনে হোলো যে, আমার এবং নিশের মধ্যে যে ধান্ধা টুকু ছিল, তা তো মিটে গিয়ে দুজনে একলা হোয়েচি, এখন তো আমি খেলেও তার খাওয়া হবে এবং সে খেলেও আমার খাওয়া

---

* পাগলের ক্ষণে ক্ষণেই দিন রাত্রি ফেরে।

হবে। এই রূপ নানা প্রকার ভেবে চিন্তে, শেষে বন হইতে কিছু ফলমূল ভিক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করিয়া, ভোজন করিল এবং জল পান জন্য সেই নদীর ধারে যাইয়া দেখিল যে, সেখানেও একজন পাগল বোসে আছে। তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করিল যে, ভাই! তোর নাম কি? ও তুই এখানে বোসে কি কোর্‌ছিস? সে বোল্লে, আমার বেশী কথা বল্‌বার অবকাশ নাই, আমার নাম "বিশে", আর এ নদী নয়, ঐ যে সুমুখে একটা বড় নদী দেখ্‌চিস্‌, আমি ঐ নদীর পারে যাবো, তারই যোগাড় কোর্‌চি, আমি আর কিছু বোল্‌তে পার্‌ছিনে, এখন আমার মাথা চুল্‌কোবার সাবকাশ নাই। দিশে বোল্লে, ভাই! তুইতো অনেকটা এগিয়ে পোড়েচিস্‌, আমরাও তো ওপারে যাবার চেষ্টায় আছি, তা আমাদের এখনও সব যোগাড় যন্ত্র ঠিক্ হয় নাই, এখনও একটু দেরী আছে। এই সকল কথার পর দিশে জল পান করিয়া, পুনরায় আসিয়া, আপন-আসনে বসিল এবং উপরোক্ত প্রশ্ন-বিষয়ের চিন্তাকরিতে লাগিল। ক্ষনেক পরেই নিশে প্রত্যাগত; এসেই বোল্লে যে, দাদা, দিশে দাদা! রাস্তায় যেতে যেতে আমার একটু ক্ষুধা বোধ হোয়েছিল, কিন্তু হাটে গিয়ে দেখ্‌লাম যে, সে সব ক্ষিধে তৃষ্ণা ঘুচে গ্যাচে। দিশে বোল্লে, তা ঘুচ্‌বেই তো, তার কারণ আছে। এখন হাটের খবর কি?

নিশেঃ—হাট তো বড় গুল্‌জার, লোকে লোকারণ্য, অনেক দোকান পসার; তবে দেখ্‌লাম যে, হাটে এক জিনিষ বৈ আর কোন জিনিষ নাই। সব দোকানেই কেবল প্রবৃত্তিই বেচা কেনা হোচ্চে, প্রবৃত্তি বৈ আর কোন জিনিষের আমদানি নাই, গ্রাহকও নাই। গতিক দেখে, এমনি বোধ হোলো যে, ঐ হাটের লোকে প্রবৃত্তি বৈ আর যে কোন জিনিষ আছে, তা তারা জানে না। সবই প্রবৃত্তি ওড়ন পাড়ন্। আবার দেখ্‌লাম যে, হাটের মাঝে খুচরো খাচরা অনেক গুলো প্রবৃত্তি-ধর্ম্মের প্রবৃত্তির দোকান আছে, তার মধ্যে দুখানা দোকানেরই চোল্‌তি, তার একখানায় প্রবৃত্তির ভোল বড় বেশী নাই, সেখানা এখন একটু মেড়ো পোড়েচে। আর এক খানায় নানা রকম

ধর্ম্ম প্রবৃত্তির ভোল্ আছে, ঐ দোকানেরই এখন চোল্‌তি বেশী; ঐটেই এখনকার বড় দোকান। গস্তদার এবং ফেরিওয়ালা প্রায় দুই দোকানেরই সমান, তবে বড় দোকানেরই গস্ত বেশী; তাঁরা নানা যায়গা থেকে ভোল্ তৈয়ার করবার ও ভোল্ ফিরোবার নানা রকম মশলা গস্ত করিয়া, ঐ সকল মশলা দিয়ে ঐ প্রবৃত্তি-ধর্ম্মের প্রবৃত্তির ভোল্ এরূপ তৈয়ার করেন ও ভোল্ ফিরোন যে, দেখ্‌লেই লোকের নিতে ইচ্ছা হয়। আর ফেরি কোরে বেড়ানো ঐ দুই দোকানেরই সমান।

আবার শুনলাম যে, আগে ঐ সব দোকানে ভারি ভারি গদিয়ান ও বড় বড় মহাজন ছিলেন। তাঁদের পুঁজির সীমা ছিল না, কাযে কাযেই তাঁদের কাছে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দুই রকম ভোল্‌ই থাকতো, তাঁরা যে যেমন খরিদদার, অধিকার বুঝে, তাকে তেমনি জিনিষ দিতেন,—কাকুই বা প্রবৃত্তির প্রবৃত্তি, ও কাকুই বা নিবৃত্তির প্রবৃত্তি দিতেন; কিন্তু এখনকার এঁরা সব প্রকৃত দোকানদার; তাঁদের সেরূপ পুঁজিও নাই, এবং নিবৃত্তির প্রবৃত্তিও নাই, সুতরাং তাঁরা সাবেক নিবৃত্তির ভোল্ একেবারে এমন কোরে উঠিয়ে দিয়েচেন যে, এখন আর নিবৃত্তির নাম গন্ধও নাই, এবং কখন ছিল বোলেও বোধ হয় না। ফলে নিবৃত্তি একটা যে বেখাদ্ জিনিষ আছে, সেটা বড় খাঁটি জিনিষ। এখন হাটটা কেবল প্রবৃত্তিরই হাট।

আমার একটু নিবৃত্তি দেখবার দরকার ছিল; তা ও-হাটে তো নিবৃত্তির কথাই নাই, তবে দুই এক জন আধ্ পাগলা গোচ্ খুচরা দোকানদার তাঁদের কাছে নিবৃত্তি আছে বোলে অভিমান কোরে, বোসে আছেন; কিন্তু দেখ্‌লাম যে, তাঁদেরও তো আসল নিবৃত্তি নয়, সবই ভেল্ এবং তার সঙ্গে পোনেরো আনা উনিশগণ্ডা তিন কড়া দুই ক্রান্তি প্রবৃত্তি মিশেল। তা ও সব নিয়ে আমি কি কোরবো? কাযে কাযেই এই সব দেখে শুনে ফিরে এলাম; তা, ভাই! হাটের যে স্রোত, তবে তোর আশীর্ব্বাদে আমার যেই এখন একটু পুঁজি হোয়েচে, তাই প্রাণ নিয়ে ধর্ম্মে ধর্ম্মে পালিয়ে আস্‌তে পেরেচি।

দিশেঃ—আমি আগে জানলে তো তোকে, ও হাটে যেতে দিতাম না, ও হাটে কি নিবৃত্তি পাওয়া যায়? ওখানে নিবৃত্তির কথাও নাই; নিবৃত্তির হাট, সে আলাদা।

ঐ যে বড় নদীটে দেখ্‌চিস, ঐ নদীর পারে পাগলের একটা হাট আছে, সেইখানেই নিবৃত্তি পাওয়া যায়, সেখানে নিবৃত্তি বৈ আর কিছুই নাই এবং নিবৃত্তির কথা বৈ আর কোন কথাও নাই; আর সেখানে যে সব মশলা আছে, সে সব মশলাই, নিবৃত্তির মশলা, সেখানে প্রবৃত্তির নামও কেউ মুখে আনে না।

নিশেঃ—তবে এই হাটের দোকানদারেরা ঐ হাট থেকে নিবৃত্তি আমদানি করেন না কেন?

দিশেঃ—একেত তাঁদের পুজি কম, আবার ঐ যে নদীটি দেখ্‌চিস, ওটি বড় সোজা নদী নয়, ও নদী সহজে পার হবার যো নাই, যদি কেউ পার হোতে পারেন, তাঁকে আর ফিরে আস্‌তে হয় না। আসা যাওয়া সব এই খানেই। অতএব এ হাটে নিবৃত্তি আন্‌বার যো নাই, এবং এখানে আসল নিবৃত্তির খাপও নাই, যে হাটে যে জিনিষের খাপ, সে হাটে সেই জিনিষের আদরই বেশী।

নিশেঃ—তুই যে ঐ নদীটী দেখালি, তা, ভাই, ও নদীটীর নাম কি?

দিশেঃ—ও নদীটীর নাম ভবনদী।

নিশেঃ—ভাই! ভব কাকে বলে?

দিশেঃ—উৎপত্তি, অর্থাৎ সংসারকেই ভব বলে, এবং বাসনাই সংসার, তুইতো তা জানিস্।

নিশেঃ—যদি উৎপত্তিকে ভব বলে, তবে শিব, যিনি উৎপত্তির লয় করেন, তাঁর নাম ভব হইল ক্যানো? ও তাঁহাকে মঙ্গলময় বল্‌বার কারণ কি?

দিশেঃ—শিব উৎপত্তি-নিবৃত্তির এবং লয়ের কর্ত্তা বটে, কিন্তু উৎপত্তির আধার মাহামায়া ভবানীও তাঁহাতে আছেন, সেই জন্য ঐ ভবানী হইতেই শিবের নাম ভব হইয়াছে। উপাধিই কেবল লিঙ্গ-ভেদ, কিন্তু যখন উপাধি শূন্য হয়, তখন আর লিঙ্গভেদ থাকে না।

আর শিবকে যে লয়কর্ত্তা বলে, তা তিনি যে জীবের নাশকর্ত্তা, এটা মনে কোরিস্ না, তিনি উৎপত্তিনাশের, অর্থাৎ নিবৃত্তির কর্ত্তা। তা হোলেই উৎপত্তিকে ভব বলে, এবং ভবই সংসার ও সংসারই বাসনা, অতএব তিনি বাসনা, অর্থাৎ সংসারের লয়কর্ত্তা বলিয়া, জীবের মুক্তির কারণ হন্, সেই জন্যই তাঁহাকে মঙ্গলময় বলে।

আর জীবের কথা এখানে তুলে কায্ নাই, তা হোলে আবার কেঁচো খুড়্‌তে খুড়্‌তে সাপ্ বেরোবে।

নিশেঃ—তুই যে ঐ ভবনদীর কথা যে ভাবে বোল্লি, অর্থাৎ "ঐ যে নদীটে দেখ্‌চিস্, ঐ নদীর পারে নিবৃত্তির হাট আছে," এতে বোধ হয় যে, আমরা যেন সব নদীর এ পারে আছি। তা তো নয়; ও নদীর এপার-ও-পার নাই, ওর সব পারই সমান, যে পারে হোক্, পারে উঠ্‌তে পার্‌লেই নিবৃত্তি। আর নদীটাই তো সংসার, আমরা *সব ঐ নদীর মাঝখানে আছি, তবে ঠিক মাঝখানটায় বেশী স্রোত* ও বড় তুফান; ধার পানে তত স্রোত এবং তত তুফান নয়, নদীর প্রবল স্রোত ও তুফান কেবল বাসনার ঠেলা ও তৃষ্ণার টান্। আবার ওদের অনুসঙ্গী ঢের আছে, কিন্তু ঐ দুটোই প্রবল; আর সঙ্কল্পেন্দ্রিয় মন ও-দের সর্দ্দার; সে কেবল বোসে বোসে কল্পনা কোর্‌চে, আর ও-দিগে দিয়েই খেলাচ্চে, তবে তারই ঝোঁক্ বেশী; সেও এক মুহূর্ত্তের জন্য স্থির নয়। ফলে ঐ দুটোরই ঠেলায় এবং টানে লোক্‌কে অস্থির কোরে নাগরদোলায় ঘুরুচ্চে ও হাবু ডুবু খাওয়াচ্চে, ও-দুটো কেবল অনবরতই টানাটানি কোর্‌চে; এক মুহূর্ত্তের জন্যও ও-রা সুস্থির নয়, ও-দুটোকে একটু স্থির কোর্‌তে না পার্‌লে, আর পরিত্রাণের উপায় নাই। ও দুটোকে একটু নিবৃত্তি কোরে, ঠেলে ঠুলে একবার ধার-পানে উঠ্‌তে পারলে, সেখানে আর তত ঠেলা ঠেলি ও তুফান নাই। ধার পানে সুধু উঠ্‌লেই হবে না, ও-খানে উঠে একমনে নিবৃত্তিকে অবলম্বন কোর্‌তে পার্‌লে, আর ও-রা ঠেলে মাঝে ফেল্‌তে পারবে না, এবং ক্রমে ক্রমে নিবৃত্তিকে শক্ত কোরে, পারে উঠে, আসল নিবৃত্তিতে পোড়তে পারা যাবে, নৈলে আবার "পুনঃ মুষিকো ভব"।

আর আমি বোলেচি যে, নিবৃত্তি একটা খাঁটি জিনিস, তাতে আর সন্দেহ হয় না। কারণ, নিবৃত্তিকে আশ্রয় না কোর্‌লে, আর এ বিপদ হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই।

লোকেরা তো ঐ বিপদ দেখ্‌তে পান্‌ না, সুতরাং ঐ বিপদকে তাঁদের বিপদ বোলে জ্ঞান হয় না, কারণ, তাঁহারা তো কখনই সম্পদ দেখেন নাই, এবং নিবৃত্তি যে সম্পদ, সে কথার উপদেশও তাঁদিগকে কেউ দেন্‌ না, ও তা দেবারও লোক অতিবিরল। কাযেকাযেই তাঁহারা গোড়াগুড়ি থেকেই ঐ বিপদ ও হাবুডুবু খাওয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক অবস্থা বলিয়া বোধ করেন ; তবে তারই মধ্যে কতকটাকে সুখ ও কতকটাকে দুঃখ বলে কল্পনা করিয়া লন্‌ ; যদি তাঁরা সুখ ও সম্পদ কখন দেখ্‌তে পেতেন, তা হোলে ঐ বিপদও টের পেতেন্‌ ; কিন্তু তাঁরা কাণা হোয়ে আপনাদের ঐ নাগরদোলায় ঘোরা ও হাবুডুবু খাওয়াতো বিপদ বোলে দেখ্‌তে পাচ্চেন না। যদি কেউ তাঁদের চোক্‌ ফুটিয়ে ঐ বিপদ দেখিয়ে এবং নিবৃত্তিভেলার সন্ধান বোলে দিতে পারেন, তা হোলে যখন তাঁদের ঐ হাবুডুবু খাওয়াকে বিপদ বোলে জ্ঞান হবে, তখন তাঁরা ব্যগ্র হোয়ে, ভাল মন্দ বিচার না কোরেই ঐ নিবৃত্তিভেলা অবলম্বন কর্‌বার চেষ্টা কোর্‌বেন, তাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ যদি কেউ সামান্য নদীর স্রোতে পোড়ে হাবুডুবু খান্‌ এবং তাঁর কাছ দিয়ে একটা মড়া ভেসে যেতে দেখেন, তখন তিনি আর ভাল মন্দ বিচার না কোরে, আপন-পরিত্রাণের জন্য ঐ মড়াকেই অবলম্বন করেন, তেমনি বিপদে পোড়্‌লে যে প্রকারে হোক্‌, তাহা হইতে উদ্ধারের চেষ্টা সকলেই করিয়া থাকেন। কিন্তু বিপদজ্ঞান না হওয়া, অর্থাৎ অজ্ঞানতাই দুঃখের মূল।

তা, ভাই দিশে দাদা! তোর আশীর্ব্বাদে তোর সঙ্গে আমিতো নদীর মাঝখান থেকে ধারপানে ঠেলে উঠেচি, কিন্তু ভয় কোচ্চে যে, পাছে যদি নিবৃত্তিকে শক্ত কোরতে না পারি, তা হোলে ঐ দুটোর ঠেলায় আবার মাঝে পোড়্‌তে হবে ; পারে উঠে আসল নিবৃত্তিতে না পোড়্‌তে পার্‌লে আর ভয় ঘুচে না।

দিশেঃ—পারে যেতে পারলে, অনেকটা সুবিধা বটে, সেখানে তো নিবৃত্তি বৈ আর কিছুই নাই। আর সেখানে যে সব সঙ্গ পাওয়া যাবে, তাঁরা সব নিবৃত্তি পাকিয়ে তুলেচেন, এবং আমরাও যেপর্য্যন্ত নিবৃত্তি পাকাতে না পারবো, সেপর্য্যন্ত আর তাঁদের সঙ্গ ছাড়বো না, তা হোলেই আর প্রবৃত্তি, অর্থাৎ বাসনা ও তৃষ্ণা আমাদের কাছে ঘেঁস্‌তে পারবে না। খুব পাকা না হোলে আর তাদের সঙ্গ ছেড়ে নিঃসঙ্গ হবো না। এখন ঠেলে ঠুলে একবার পারে উঠ্‌তে পার্‌লে হয়, ভয় করিস্‌ না, মন খুব ঠিক রাখিস্‌।

আর ভয়ের কথা বোল্‌ব কি, পারে গেলেও ভয় ঘোচ্‌বার যো নাই; নিবৃত্তি শেষ না হোলে, আর ভয় ঘুচ্‌বে না।

অনুরাগীর সঙ্গ সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র ত্যাগ করিতে হইবে, অনুরাগীর সঙ্গ হোলেই সম্পূর্ণ ভয়ের কারণ। যথা,—

সৌভরিক মুনি জলমধ্যে সমাধি আশ্রয় করেন, তথায় এক মৎস্যের সহিত মিত্রতা হওয়াতে তাঁহার সমাধি বিনষ্ট হয়। হরিণশিশু-সম্বন্ধে জড়ভরতের উপাখ্যানও ঐরূপ।

অতএব অনুরাগীর সঙ্গই অনর্থের মূল।

তত্ত্বজ্ঞানী সকল মুনিরই এইরূপ উপদেশ।

নিশেঃ—তুই যে বোল্‌ছিলি, পাতিব্রত্য ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত করা স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম; তা পাতিব্রত্য ও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত কাকে বলে, ও তাতে কি হয়?

দিশেঃ—স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্যসম্বন্ধে আমি এই বলি,—

পতি যে স্ত্রীর একমাত্র গুরু, এ কথা কেহ অস্বীকার করেন না। যথা,—

"পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং"

সুধু গুরু ক্যানো, পতি স্ত্রীর গুরু এবং উপাস্য দেবতাও।

আর পতিসেবা, পতির পূজা ও উপাসনাদি কার্য্যে নিয়ত রত থাকাকেই পাতিব্রত্য বলে। পতিব্রতা স্ত্রীর উপাস্য ও সাক্ষাৎ সাকার দেবতা তাঁহার পতি, অতএব তিনি ঐ সাকার পতির উপাসনা সিদ্ধি

করিতে পারিলে, ঐ সাকার পতির আকারে স্বীয় আকার, ও তাঁহার আত্মায় নিজ আত্মা, লীন জ্ঞানসিদ্ধি দ্বারা মুক্তিলাভ করিতে পারেন; যদি স্ত্রী সাকার পতি উপাসনাসিদ্ধি লাভ করিতে না পারেন এবং পতির মৃত্যু হইয়া, তাঁহার আকার লয়প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার ঐ পাতিব্রত্য শেষ হইয়া, তাঁহাকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করিতে হয়; কিন্তু যদি তাঁহার সাক্ষাৎ সাকার পতি উপাসনাসিদ্ধির পর, অর্থাৎ পতিদেহে ও আত্মায় নিজ দেহ ও আত্মা লীন জ্ঞানসিদ্ধির পর পতির মৃত্যু হয়, তা হোলে পতির মৃত্যুতে তাঁহারও মৃত্যু হইবে। যদি ঐ মৃত্যুতে তাঁহার প্রাণবায়ু একেবারে বিনির্গত না হইয়া কিছু অবশিষ্ট থাকাহেতু তাঁহার দেহ জীবিত থাকে, তা হোলেও ঐ জীবিত দেহকে তাঁহার মৃত দেহ জ্ঞান হইবে। সেই জন্য পরাশর ও মনু-ঠাকুর স্ত্রীলোকের ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রথমতঃ পাতিব্রত্য, ও পতির মৃত্যু হইলে সহমৃতা হওয়া, তদ্‌ভাবে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করা, স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম বলিয়া ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন স্ত্রীলোকের ঐ ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের কার্য্য এই যে, তাঁহার নিরাকার পতি, অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ পতি-আত্মার উপাসনাব্রতে ব্রতী হইয়া, ঐ উপাসনা সিদ্ধি করিতে পারিলে, তিনি ঐ নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ পতি-আত্মায় নিজ আত্মা লীন হওয়া জ্ঞানসিদ্ধি দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারেন।

তা হোলে সাকার পতির উপাসনাদি কার্য্যে রত থাকাকেই পাতিব্রত্য, ও নিরাকার পতির উপাসনাদি কার্য্যে রত থাকাকেই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত বলে। স্ত্রীলোকের এই দুই ব্রত ভিন্ন অন্য কোন ব্রত নাই, এবং অন্য ব্রতের প্রয়োজনও নাই।

সতু ঠাকুরের স্ত্রী এই পাতিব্রত্যের আদর্শ, তাঁহার ঐ ব্রত সিদ্ধি হইয়া পতি-দেহে ও আত্মায় তাঁহার দেহ ও আত্মা লীন হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার পতির অকাল ও দৈব মৃত্যুতে ঐ মৃত্যু সম্পূর্ণ না হওয়ায়, তিনি ঐ মৃত্যুকে নাশ করিয়াছিলেন; নতুবা পতির স্বাভাবিক পূর্ণ মৃত্যু হইলে, পতির মরণে তাঁহারও মরণ হইয়া, তিনি সহমৃতা হইতেন, তাহাতে আর সন্দেহ হয় না।

এখন, কি দুঃখের বিষয় যে, প্রায় সকল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ই স্ত্রীলোকদিগে ঐরূপ পাতিব্রত্যের উপদেশ না দিয়া, কেবল অন্যান্য ব্রত নিয়ম করিবার উপদেশ দেন; আবার বলেন যে, আগে দীক্ষিত না হোলে, ব্রত করিবার অধিকার হয় না; এইরূপে তাহাদিগে ভ্রমান্ধ করিয়া, আপনারাই কেহ তাহাদের গুরু হন্ ও অন্য একটি দেব কি দেবীকে তাহাদের উপাস্য দেবতা যোটাইয়া দেন! *

কি আশ্চর্য্য! স্বামী যিনি স্ত্রীর একমাত্র গুরু এবং উপাস্য দেবতা; ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই গুরু এবং উপাস্য দেবতা হরণ করিয়া, নিজে সেই স্ত্রীর গুরু হন্ এবং অন্য একটী উপাস্য দেবতা তাহাকে যোটাইয়া দেন; ইহাতে কি ঐ স্ত্রীকে তাঁহার ব্যভিচারিণী করা হয় না?

যদি বলেন যে, ঐ গুরু ও উপাস্য দেবত্ব বজায় রেখে, তার সঙ্গে তিনিও গুরু হন্, ও আর একটী উপাস্য দেবতা বলিয়া তাহাকে মন্ত্র দেন; মূল গুরু এবং উপাস্য দেবতা হরণ করেন না।

তাহোলে স্বামীকে স্বামী রেখে, স্ত্রী, আর একটী স্বামী কোর্‌লে, যদি ব্যভিচার দোষ না হয়, তবে ঐ স্বামি-গুরুকে, গুরু রেখে, আর একটী গুরু কোর্‌লেও ঐ দোষ হয় না, কিন্তু যদি স্বামীকে স্বামী রেখে আর একটী স্বামী কোর্‌লে ব্যভিচার দোষ হয়, তবে ঐ স্বামিগুরুকে গুরু রেখে আর একটী গুরু কোর্‌লে ঐরূপ ব্যভিচার দোষ হবে না ক্যানো? তার তো কোন কারণ দেখা-যায় না; কেননা, ঐ দুইটী বিষয় তুলনা কোরে দেখ্‌লে, কেবল এই মাত্র প্রভেদ বোধ হয় যে, একটী মোটা, ও একটি সরু। যদি বলেন যে, স্ত্রীলোকদিগে পতিব্রতা ধর্ম্মের উপদেশ দেবার জন্য ঐরূপ গুরু হন; তাহোলে আর এক দেবতাকে উপাসনা কোর্‌তে

* কুলগুরু ঐ ভট্টাচার্য্যের মধ্যেই পরিগণিত, কিন্তু স্বামীর গুরুসম্বন্ধে আলাদা কথা, যথা।—শিষ্যের শিষ্যকে পুনরায় মন্ত্র দিলে ব্যভিচার দোষ হয়, অর্থাৎ শিষ্যের শিষ্য অপহরণ করা হয়।

বোলে, তাকে মন্ত্র দেন ক্যানো? আসল কথা, তাঁর তো সে উদ্দেশ্য নয়, কেননা পতিব্রতা ধর্ম্মের উপদেশ দিতে হইলে, স্বামীই স্ত্রীর উপাস্য দেবতা ও পরম গুরু এবং স্বামী অপেক্ষা এই জগতে তাঁহার পক্ষে অন্য কোন বস্তু, কি ব্যক্তি, শ্রেষ্ঠ নয়, এইরূপ উপদেশ দিতে হয়। তাহোলে স্বামী অপেক্ষা আপনাকে হীন বলিতে হয়, কিন্তু তাঁরতো সে ইচ্ছা নয়, তাঁর ইচ্ছা যে, তিনি স্বামী অপেক্ষা বড় হবেন, এবং স্বামীর কথা লঙ্ঘন হবে, তবু তাঁর কথা লঙ্ঘন হবে না ও স্বামীও স্ত্রীর অনুরোধে তাঁহাকে গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। ফলে আবার তেমন স্বামীর হাথে পোড়লে বিলক্ষণ টের প্যান্।

আবার এ দিকে বিলক্ষণ আটুনি, তিনিতো এক জনার হাত ছাড়িয়ে গুরু হন্, কিন্তু পাছে আবার তাঁর হাত ছাড়া হয়, সেই জন্য তার পর তাঁকে ছেড়ে কি রেখে অন্য গুরু কোর্‌লে মহাপাপ হয় বোলে বিলক্ষণ শাসন আছে।

মূল কথা, পতিই স্ত্রীলোকের গুরু ও উপাস্য দেবতা এবং পাতিব্রত্য অথবা ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মই তাহাদের মুক্তির কারণ, তদন্যথায় অন্য গুরু, কি উপাস্য দেবতা, গ্রহণ এবং অন্য কোন ব্রতাচরণ করিলে, তাহাদিগে ব্যভিচারদোষে দোষী হইতে হয়, সেই জন্যই পাতিব্রত্য ও ব্রহ্মচর্য্য স্ত্রী লোকের ধর্ম্ম ভিন্ন তাহাদের মুক্তিসম্বন্ধে যে, আর কোন সাধনা, কি কার্য্য করিতে হইবে, এরূপ উপদেশের কথা কোন মুনিঠাকুরই কোন জায়গায় কাকুইকেই বলেন নাই।

যদি বল যে, কোন কোন মুনিঠাকুর স্ত্রীকে পতির সহধর্ম্মিণী বলিয়াছেন, সুতরাং মুক্তিসম্বন্ধে পুরুষের প্রতি যেরূপ উপদেশ, স্ত্রীলোকের প্রতিও সেইরূপ উপদেশ, বলিতে হইবে; তা হোলে মুনিঠাকুররা তো অধিকারবিশেষে পুরুষদিগে সর্ব্বথা স্ত্রীসঙ্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু স্ত্রীলোকদিগে পুরুষসঙ্গ ত্যাগের উপদেশ তো কোথাও দেন নাই। ইহাতে যদি বল যে, যখন পুরুষকে স্ত্রীসঙ্গত্যাগের উপদেশ আছে, তখন সেই মূলেই স্ত্রীকেও পুরুষসঙ্গত্যাগের উপদেশ জ্ঞান করিতে হইবে।

কিন্তু যখন পাতিব্রত্য, অথবা ব্রহ্মচর্য্য স্ত্রীলোকের সার ধর্ম্ম বলিয়া সকল মুনিঠাকুরই উপদেশ দিয়াছেন, তখন পুরুষসঙ্গত্যাগ, স্ত্রীর প্রতি এরূপ উপদেশ কখনই প্রয়োগ হইতে পারে না। অতএব পাতিব্রত্য, অথবা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত ভিন্ন মুক্তিসম্বন্ধে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অন্য কোন উপদেশ কোন মুনিঠাকুরই কখন দেন্ নাই।

আর মুনিঠাকুররা যে, স্ত্রীকে স্বামীর সহধর্ম্মিণী বলিয়াছেন, তাহাতে যে, স্ত্রী স্বামী সহ স্বামীর কোন পৃথক্ যজ্ঞে, কি ব্রতাদিতে ব্রতী হইবে, তাহা নহে; স্ত্রীর এক মাত্র ব্রতই পাতিব্রত্য, অথবা ব্রহ্মচর্য্য, অর্থাৎ সে স্বামীর যজ্ঞাদি কার্য্যে সাহায্য করিয়া কেবল আপন-পতিব্রতা ধর্ম্মের কার্য্য সম্পাদন করিবেমাত্র, নতুবা স্বামী সহ অন্য কোন ব্রতে ব্রতী হওয়া, তাহার ধর্ম্ম নয়। পাতিব্রত্য, অথবা ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মাচরণেই তাহার স্বর্গ এবং তদ্দ্বারা মুক্তিলাভ হইবে।

ঐ সম্বন্ধে মনুঠাকুর আবার বিশেষ কোরে বোলেচেন যে,—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষিতং।
পতিং শুশ্রূষতে যেন তেন স্বর্গে মহীয়তে॥

মনুসংহিতা।

নিশেঃ—নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ মৃত পতির আত্মা উপাসনাসিদ্ধিতে মুক্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু তুই বোল্লি যে, পাতিব্রত্য, অর্থাৎ সাক্ষাৎ সাকার পতি-উপাসনাসিদ্ধিতেও মুক্তি হইতে পারে; এ কথায় আমার ধোঁকা লেগেচে, কারণ, যখন নির্গুণ উপাসনা ভিন্ন সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ হয় না, এবং সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভ ভিন্ন মুক্তি হইতে পারে না, তখন সাকার পতির উপাসনাসিদ্ধিতে কিরূপে মুক্তি হইবে?

দিশেঃ—তুই যা বোল্লি, তা ঠিক্, আমি ও কথাটা মোটা মোটি বোলেচি, সাকার পতিকে উপাস্য দেবতা জ্ঞানে ঐ পতির উপাসনা-সিদ্ধিতে স্ত্রীর প্রকৃত মুক্তি লাভ, অর্থাৎ সমস্ত বন্ধন মুক্ত, হয় না,

কিন্তু ঐ উপাসনাসিদ্ধিতে এ স্ত্রী দেবলোক (পতিলোক) প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সালোক্য মুক্তি বলে।

নিশেঃ—মুক্তি কি আবার নানাপ্রকারের আছে না কি?

দিশেঃ—হাঁ, মুক্তি নানাপ্রকার আছে, এখন সে সব কথায় কায নাই, সময়ান্তরে সে সব কথা হবে।

নিশেঃ—দিশেঃ—আমাদের যা বলা বোলি হোলো, এতো সবই প্রবৃত্তিসমাজ*সম্বন্ধে কথা, তবে মধ্যে মধ্যে নিবৃত্তির কথা আছে। কিন্তু প্রবৃত্তির কথা আর ভাল লাগ্‌চে না, অতএব প্রবৃত্তির কথা বোনতে এই খানেই ক্ষান্ত হওয়া যাক্‌।

দ্বিতীয় কাণ্ডে কেবল নিবৃত্তি বিষয়ের আলোচনা করিতে হইবে।

আকার লোপ করাই পাগলদের উদ্দেশ্য, সেই জন্য ২৫শ পৃষ্ঠায় প্রথম ছত্রের সর্ব্বশেষের আকারটী লোপ হইয়াছে। শেষে নৈলে আকারলোপ হওয়া সম্ভবও নয়।

---

* কেবল বিষয়ানুরাগী, সংসারমায়ায় মুগ্ধ ও উন্মত্ত এবং আশ্রম ও ধর্ম্ম কর্ম্ম-ভ্রষ্ট, ধনলোলুপ।

R. G. M.